দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-১: ডেটা কমিউনিকেশন, ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের উপাদান, ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড।

ডেটা কমিউনিকেশনঃ কমিউনিকেশন শব্দটি Communicare শব্দ হতে এসেছে যার অর্থ to share(আদান-প্রদান/বিনিময়)। সুতরাং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক যন্ত্র থেকে অন্য যন্ত্রে নির্ভরযোগ্যভাবে ডেটা বা তথ্যের বিনিময় বা আদান-প্রদান হচ্ছে ডেটা কমিউনিকেশন।
ডিজিটাল কমিউনিকেশনের পূর্বে দূরবর্তী কোন স্থানে তথ্য আদান-প্রদান করার জন্য মাধ্যম হিসাবে মানুষ ব্যবহৃত হতো। অর্থাৎ মানুষ এক স্থান হতে অন্য স্থানে তথ্য পৌঁছে দিত। তাছাড়া পায়রার(কবুতর) পায়ে চিঠি বেধে দিয়েও মানুষ কমিউনিকেশন করতো। পরবর্তীতে টেলিগ্রাম, টেলিফোনের মত যন্ত্রগুলো আবিষ্কারের মাধ্যমে যোগাযোগের ধারণা পালটে যায়। এরপর রেডিও, টেলিভিশন ও ইন্টারনেট আবিষ্কারের ফলে যোগাযোগের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়। এখন টেক্সট ও অডিও এর পাশাপাশি ভিডিও আদান-প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

সিস্টেমঃ কোনো নির্দিস্ট কাজ সহজে এবং সঠিকভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সুসংবদ্ধ রীতি-নীতিকে সিষ্টেম বলে।
ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমঃ কমিউনিকেশন শব্দের অর্থ যোগাযোগ এবং সিস্টেম অর্থ ব্যবস্থা বা পদ্ধতি। অর্থাৎ যে সিস্টেম এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কিংবা এক যন্ত্র থেকে অন্য যন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যভাবে উপাত্ত বা তথ্যকে স্থানান্তরিত করে তাকে ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম বলে। উদাহরণ- রেডিও কমিউনিকেশন সিস্টেম, টেলিকম কমিউনিকেশন সিস্টেম ইত্যাদি।

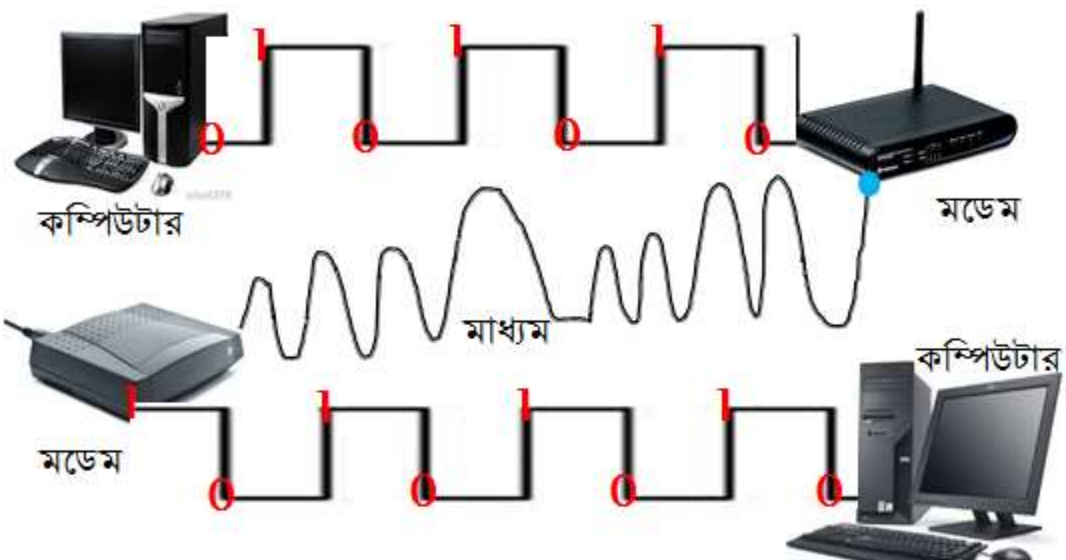

চিত্র: ডেটা কমিউনিকেশন সিষ্টেম

ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের উপাদানসমূহঃ ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে ৫ টি মৌলিক উপাদান বা অংশ রয়েছে। যথাঃ

১। উৎস (Source)

২। প্রেরক (Transmitter)

৩। মাধ্যম (Medium)

৪। প্রাপক (Receiver)

৫। গন্তব্য (Destination)

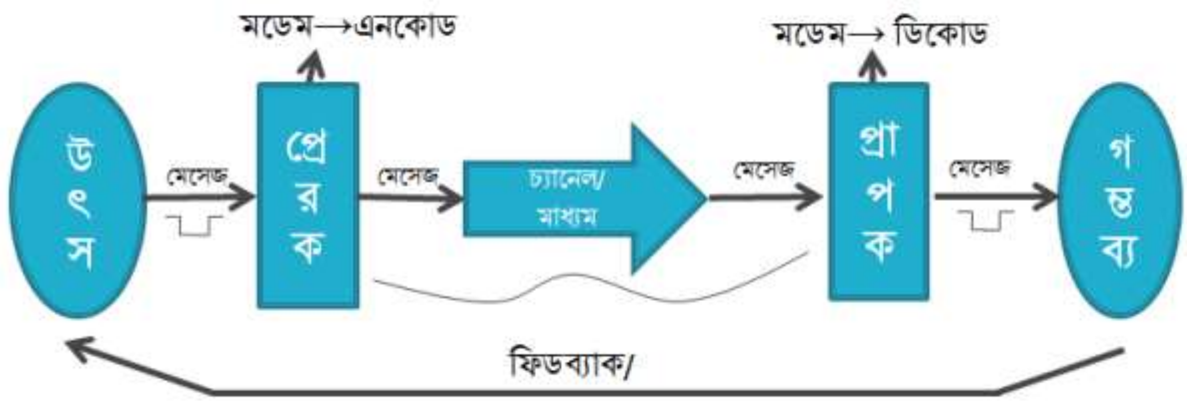

উৎস: যে ডিভাইস হতে ডেটা পাঠানো হয় তাকে উৎস বলে। যেমন- কম্পিউটার, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন ইত্যাদি।

প্রেরক: ডেটাকে উৎস থেকে একটি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রাপকের কাছে প্রেরণ করে। এর কাজ হচ্ছে ডেটাকে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মধ্য দিয়ে প্রেরণের উপযোগী করে রুপান্তর করা এবং ডেটার নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনে একে এনকোড করা। যেমন: মডেম। মানুষের ভাষাকে কম্পিউটারের/মেশিনের ভাষায় পরিনত করাকে **এনকোড** বলে।

মাধ্যম: যা উৎস ও গন্তব্য ডিভাইসকে যুক্ত করে এবং যার মধ্য দিয়ে ডেটা স্থানান্তর হয় তাকে মাধ্যম বা কমিউনিকেশন চ্যানেল বলে। মাধ্যম দুই ধরণের হতে পারে। যেমন: তার মাধ্যম (কোএক্সিয়াল ক্যাবল, টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, ফাইবার অপটিক ক্যাবল) এবং তারবিহীন (রেডিও ওয়েব, মাইক্রোওয়েব, ইনফ্রারেড ওয়েব) মাধ্যম।

প্রাপক: কমিউনিকেশন সিস্টেমে যার কাছে ডেটা পাঠানো হয় তাকে প্রাপক বা গ্রাহক বলে। গ্রাহকের কাজ হচ্ছে ট্রান্সমিশন সিস্টেম থেকে ডেটা সিগনাল গ্রহন করা এবং এ সিগনালকে গন্তব্য ডিভাইসের বোধগম্য(ডিকোড) করে উপস্থাপন করা।কম্পিউটারের/মেশিনের ভাষাকে মানুষের ভাষায় পরিনত করাকে **ডিকোড** বলে।

গন্তব্য: যার উদ্দেশ্যে বা যে যন্ত্রে ডেটা পাঠানো হয় অর্থাৎ ট্রান্সমিশনের পর ডেটা সর্বশেষ যে যন্ত্রে পৌঁছে তাকে গন্তব্য বলে। যেমন- কম্পিউটার, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন ইত্যাদি।

ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের দক্ষতাঃ একটি ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের দক্ষতা নির্ভর করে নিমোক্ত বিষয়গুলোর উপর। যথাঃ

১। সিস্টেমের ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড বা ব্যান্ডউইথ

২। সিস্টেমের ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড

৩। সিস্টেমের ডেটা ট্রান্সমিশন মোড

৪। সিস্টেমের ডেটা ট্রান্সমিশন মাধ্যম

ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিডঃ প্রতি সেকেন্ডে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটার বা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে যে পরিমান ডেটা ট্রান্সফার হয় তাকে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড বলে। অর্থাৎ ডেটা ট্রান্সফারের হারকে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড বলে।ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিডকে আবার ব্যান্ডউইথও বলা হয়। এই ব্যান্ডউইথ বা ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড সাধারণত Bit per Second (bps), Mbps, Gbps ইত্যাদি এককে পরিমাপ করা হয়। বাইনারী ডিজিট ০ এবং ১ কে বিট বলে। একে b দ্বারা প্রকাশ করা হয়। 58 kbps বলতে বোঝায় প্রতি সেকেন্ডে 58 কিলোবিট ডেটা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে স্থানান্তরিত হয়।

- ***১ বাইট*= *৮ বিট***
- ***১ কিলোবাইট*= *১০২৪ বাইট***
- ***১ মেগাবাইট*= *১০২৪ কিলোবাইট***
- ***১ গিগাবাইট*= *১০২৪ মেগাবাইট***
- ***১ টেরাবাইট*= *১০২৪ গিগাবাইট***

একটি সিস্টেমের ব্যান্ডউইথ যত বেশি হবে সিস্টেমের মধ্য দিয়ে ডেটা আদান-প্রদান তত বেশি হবে। ডেটা ট্রান্সফার গতির উপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১। ন্যারো ব্যান্ড (Narrow Band)

২। ভয়েস ব্যান্ড (Voice Band)

৩। ব্রড ব্যান্ড (Broad Band)

ন্যারো ব্যান্ড : ন্যারো ব্যান্ডের ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড ৪৫ থেকে ৩০০bps পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটি সাধারণত ধীরগতিতে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন- টেলিগ্রাফিতে ন্যারো ব্যান্ড ব্যবহৃত হয়।
ভয়েস ব্যান্ড: ভয়েস ব্যান্ডের ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড ১২০০bps থেকে ৯৬০০ bps পর্যন্ত হয়ে থাকে। ন্যারো ব্যান্ডের চেয়ে দ্রুত গতিতে ডেটা স্থানান্তর হয়ে থাকে। এটি সাধারণত টেলিফোনে বেশি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কম্পিউটার থেকে প্রিন্টার বা কার্ড রিডারে ডেটা স্থানান্তরে ব্যবহৃত হয়।
ব্রড ব্যান্ড: ব্রড ব্যান্ডের ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড কমপক্ষে ১ Mbps হয়ে থাকে। সাইবার লাইন(DSL-Digital Satellite Link), রেডিও লিংক, মাইক্রোয়েভ, স্যাটেলাইট, ফাইবার অপটিক ক্যাবল ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-২: ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড।

ডেটা ট্রান্সমিশন মেথডঃ ডেটা ট্রান্সমিশন বলতে ডেটা পরিবহন বা ডেটার স্থানান্তরকে বুঝায়। ডেটা ট্রান্সমিশন হওয়ার জন্য প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকতে হয়, এই পদ্ধতিকে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড বা পদ্ধতি বলে। তারের সংযোগের ওপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

- **১। সমান্তরাল ডেটা ট্রান্সমিশন (Parallel Data Transmission)**
- **২। অনুক্রম ডেটা ট্রান্সমিশন (Serial Data Transmission)**

সমান্তরাল ডেটা ট্রান্সমিশনঃ প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে সমান্তরালে ডেটা চলাচল করলে তাকে সমান্তরাল ডেটা ট্রান্সমিশন বলে।

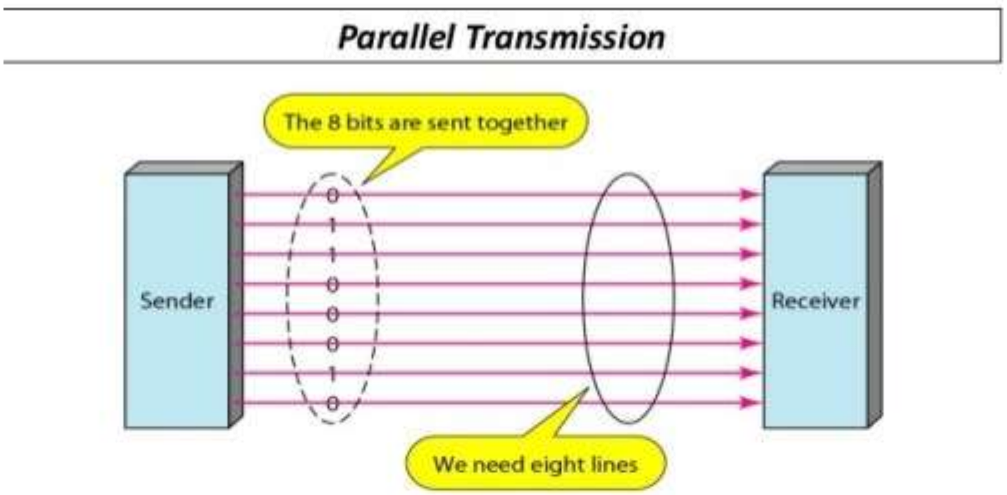

সুবিধাঃ দ্রুত গতি সম্পন্ন পদ্ধতি।

অসুবিধাঃ এই পদ্ধতি ব্যয় সাপেক্ষ কারণ n বিট ডেটা ট্রান্সমিশন করার জন্য n টি লাইন প্রয়োজন।

উদাহরনঃ প্যারালাল প্রিন্টার পোর্ট ও ক্যাবল ব্যবহার করে কম্পিউটারের সাথে প্রিন্টারের সংযোগ।

অনুক্রম ডেটা ট্রান্সমিশনঃ প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে একটি বিটের পর অপর বিট চলাচল করলে তাকে অনুক্রম ডেটা ট্রান্সমিশন বলে।

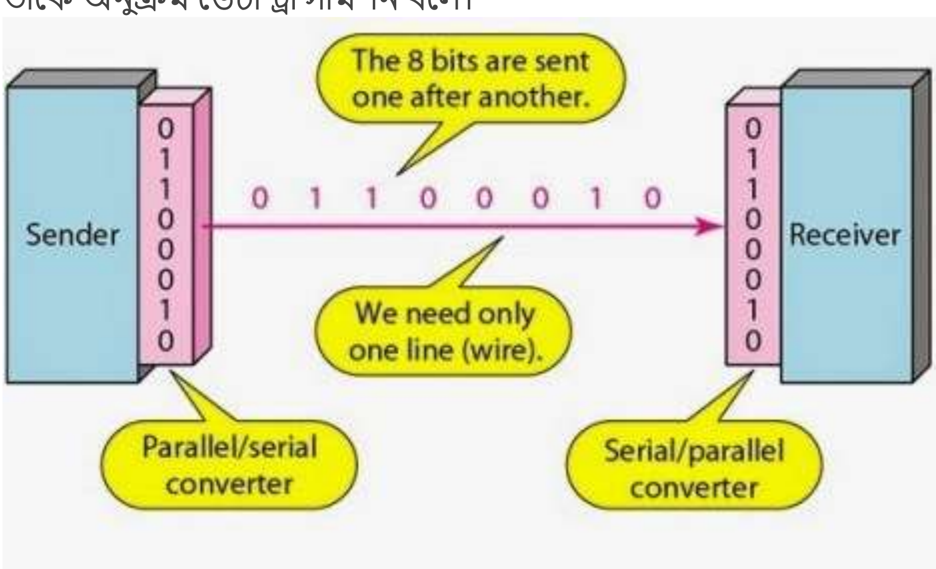

সুবিধাঃ ব্যয় কম কারণ ডেটা চলাচলের জন্য একটি লাইন বা পথের প্রয়োজন হয়।
অসুবিধাঃ একই সময়ে একটি মাত্র বিট স্থানান্তরিত হয়। ফলে ধীর গতি সম্পন্ন।
উদাহরণঃ মডেম, মাউস, ইতাদি যন্ত্রে সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে ডেটা আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

বিট সিনক্রোনাইজেশনঃ সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে সিগন্যাল পাঠানোর সময় বিভিন্ন বিটের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। এই সমন্বয় না থাকলে প্রাপক যন্ত্র ডেটার শুরু ও শেষ বুঝতে পারে না। ফলে ডেটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে সিগন্যাল পাঠানোর সময় বিভিন্ন বিটের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিকে বলা হয় বিট সিনক্রোনাইজেশন।

এই বিট সিনক্রোনাইজেশনের উপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি তিন প্রকারঃ

- ১। অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission)
- ২। সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (synchronous Transmission)
- ৩। আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Isochronous Transmission)

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনঃ অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে(Asynchronous Transmission) ডেটা প্রেরক হতে প্রাপকে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার পাঠানো হয়। এ ধরনের ট্রান্সমিশনে প্রেরক যে কোনো সময় ডেটা প্রেরণ করতে পারে এবং প্রাপক তা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য প্রেরকের কোন প্রাথমিক স্টোরেজে সংরক্ষনের প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি ক্যারেক্টারের শুরুতে একটি Start Bit এবং শেষে একটি Stop Bit পাঠানো হয়। প্রতিটি ক্যারেক্টার পাঠানোর মাঝখানের সময়ের ব্যবধান ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

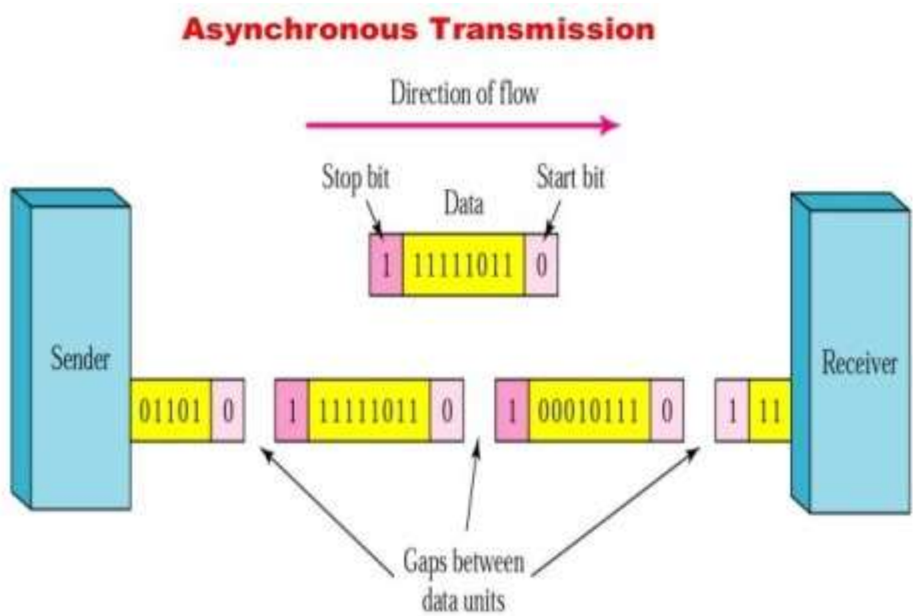

সুবিধাঃ

- ১। যেকোনো সময় প্রেরক ডেটা পাঠাতে পারে এবং প্রাপক তা গ্রহণ করতে পারে।
- ২। প্রেরক স্টেশনে প্রাইমারি স্টোরেজের প্রয়োজন হয় না।
- ৩। তুলনামুলকভাবে খরচ কম।
- ৪। কম ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী।

অসুবিধাঃ

- ১। দক্ষতা ও গতি কম।
- ২। যখন ডেটা চলাচল বন্ধ থাকে তখন মাধ্যমটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।

ব্যবহারঃ

- ১। কম্পিউটার হতে প্রিন্টারে
- ২। কার্ড রিডার হতে কম্পিউটারে
- ৩। কম্পিউটার হতে কার্ড রিডারে
- ৪। কীবোর্ড হতে কম্পিউটারে

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনঃ এ পদ্ধতিতে ডেটা প্রেরক হতে প্রাপকে ব্লক আকারে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে প্রেরক স্টেশনে ডেটাগুলিকে প্রাথমিক স্টোরেজে সংরক্ষণ করে নেওয়া হয়। তারপর ডেটার ক্যারেক্টারগুলোকে ব্লক বা প্যাকেট আকারে ভাগ করে প্রতিবারে একটি করে ব্লক বা প্যাকেট ট্রান্সমিট করা হয়। ব্লক ডেটার শুরুতে এবং শেষে যথাক্রমে হেডার এবং ট্রেইলর ইনফরমেশন থাকে। সাধারণত 80 হতে 132 টি বর্ণ নিয়ে এক একটি ব্লক তৈরি হয়। দুটি ব্লকের মাঝখানে সময় বিরতি সমান হয়ে থাকে।

Synchronous Transmission

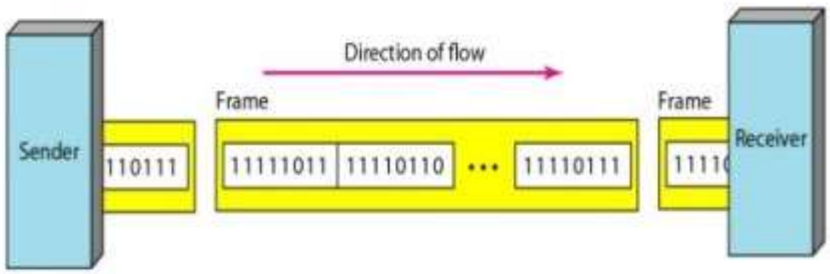

সুবিধাঃ

- ১। সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের দক্ষতা অ্যাসিনক্রোনাসের তুলনায় বেশি।
- ২। ট্রান্সমিশন গতি অনেক বেশি।
- ৩। প্রতি ক্যারেক্টারের মাঝে বিরতির প্রয়োজন হয় না।
- ৪। প্রতি ক্যারেক্টারের শুরুতে Start bit এবং শেষে Stop bit এর প্রয়োজন হয় না।

অসুবিধাঃ

- ১। প্রেরক স্টেশনে একটি প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।
- ২। তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

ব্যবহারঃ

- ১। কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে ডেটা কমিউনিকেশনে ।
- ২। এক স্থান থেকে দূরবর্তী কোন স্থানে ডেটা স্থানান্তরে ।

আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশনঃ এটি অ্যাসিনক্রোনাস ও সিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন এর সমন্বিত রুপ, যাকে আবার সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের উন্নত ভার্সনও বলা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে ডেটা প্রেরক হতে প্রাপকে ব্লক আকারে স্থানান্তরিত হয়।দু'টি ব্লকের মধ্যে সময়ের পার্থক্য 0 (শূন্য) একক করার চেষ্টা করা হয়।

সুবিধাঃ

- ১। ট্রান্সমিশন গতি অনেক বেশি।
- ২। প্রতি ক্যারেক্টারের মাঝে বিরতির প্রয়োজন হয় না।
- ৩। প্রতি ক্যারেক্টারের শুরুতে Start bit এবং শেষে Stop bit এর প্রয়োজন হয় না।

অসুবিধাঃ

- ১। প্রেরক স্টেশনে একটি প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।
- ২। ডেটা ব্লক যথাযথভাবে প্রাপক পেয়েছে কিনা তা চেক করা যায় না এবং ভূল সংশোধন করার ব্যবস্থা নেই।
- ৩। তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

ব্যবহারঃ

- ১। সাধারণত রিয়েল টাইম অ্যাপ্লিকেশনের ডেটা ট্রান্সফারে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- ২। বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশন যেমন- অডিও বা ভিডিও কল এর জন্য এই পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-৩: ডেটা ট্রান্সমিশন মোড।

ডেটা ট্রান্সমিশন মোডঃ উৎস থেকে গন্তব্যে ডেটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ডেটা প্রবাহের দিককে বলা হয় ডেটা ট্রান্সমিশন মোড। ডেটা প্রবাহের দিকের উপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন মোডকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

- ১। সিমপ্লেক্স (Simplex)
- ২। হাফ-ডুপ্লেক্স (Half-Duplex)
- ২। ফুল-ডুপ্লেক্স (Full-Duplex)

সিমপ্লেক্স: এই ডেটা ট্রান্সমিশন মোডে কেবলমাত্র একদিকে ডেটা প্রেরনের ব্যবস্থা থাকে। যেমন: কীবোর্ড থেকে কম্পিউটারে ডেটা প্রেরণ, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থা।

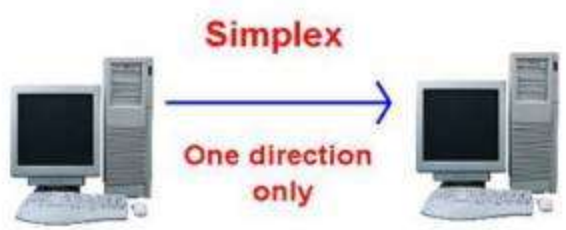

হাফডুপ্লেক্স: এই ডেটা ট্রান্সমিশন মোডে ডেটা উভয় দিকে প্রবাহিত হয় কিন্তু একসাথে নয়। যেমনঃ ওয়াকি-টকির মাধ্যমে যোগাযোগ।

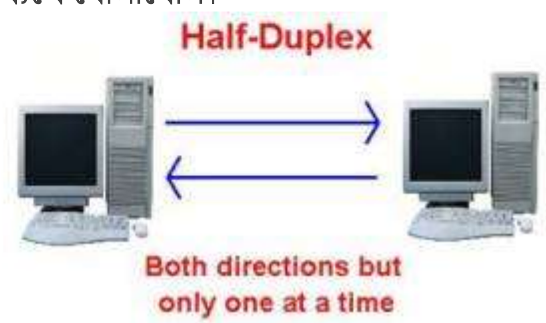

ফুলডুপ্লেক্স: এই ডেটা ট্রান্সমিশন মোডে ডেটা একই সময়ে উভয় দিকে প্রবাহিত হয়। এই মোডে একই সময়ে একই সাথে প্রেরক বা প্রাপক ডেটা গ্রহণ বা প্রেরন করতে পারে। যেমন: মোবাইল ফোন, টেলিফোন ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থা।

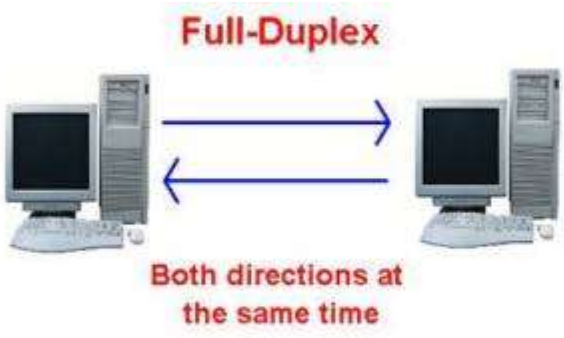

যেকোন ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে একই সময়ে একটি প্রেরক ডেটা প্রেরণ করলে তা এক বা একাধিক প্রাপক সহজেই গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু একাধিক প্রেরক ডেটা প্রেরণ করলে তা এক বা একাধিক প্রাপক গ্রহণ করতে ডেটা কলিশন বা সংঘর্ষ হয়। তাই প্রাপকের সংখ্যা ও ডেটা গ্রহনের অধিকারের উপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন মোডকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। ইউনিকাষ্ট (Unicast)

২। ব্রডকাষ্ট (Broadcast)

৩। মাল্টিকাস্ট (Multicast)

ইউনিকাষ্ট: ইউনিকাষ্ট হলো পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ট্রান্সমিশন সিস্টেম। অর্থাৎ কোন নেটওয়ার্কের একটি প্রেরক থেকে ডেটা প্রেরণ করলে ঐ নেটওয়ার্কের শুধুমাত্র একটি প্রাপক সেই ডেটা গ্রহন করবে, ডেটা ট্রান্সমিশনের এরুপ মোডকে বলা হয় ইউনিকাষ্ট। এই ট্রান্সমিশনে ডেটার আদান-প্রদান সিমপ্লেক্স, হাফ-ডুপ্লেক্স ও ফুল-ডুপ্লেক্সে মোডে সম্পন্ন হতে পারে। নিচের নেটওয়ার্কে শুধু একজন ডেটা পাঠাচ্ছে এবং একজন ডেটা গ্রহন করছে। যেমন-টেলিফোন সিস্টেম।

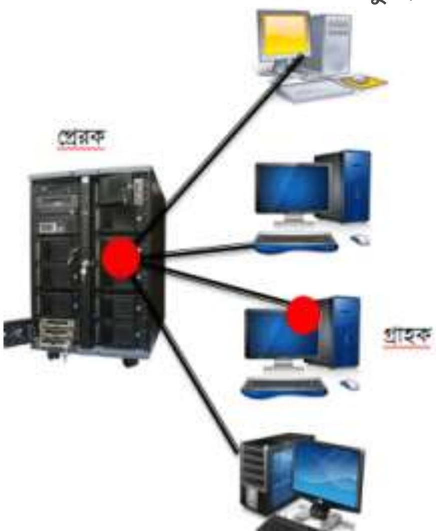

ব্রডকাষ্টঃ ব্রডকাষ্ট হলো পয়েন্ট-টু-মাল্টিপয়েন্ট ট্রান্সমিশন সিস্টেম। অর্থাৎ কোন নেটওয়ার্কের একটি প্রেরক থেকে ডেটা প্রেরণ করলে ঐ নেটওয়ার্কের সকল প্রাপকই সেই ডেটা গ্রহণ করবে, ডেটা ট্রান্সমিশনের এরুপ মোডকে বলা

হয় ব্রডকাষ্ট। নিচের নেটওয়ার্কে শুধু একজন ডেটা পাঠাচ্ছে এবং সবাই ডেটা গ্রহন করছে। যেমন- রেডিও, টেলিভিশন কমিউনিকেশন সিস্টেম।

মাল্টিকাষ্টঃ মাল্টিকাষ্ট হলো পয়েন্ট-টু-সিলেক্টেড-মাল্টিপয়েন্ট ট্রান্সমিশন সিস্টেম। অর্থাৎ কোন নেটওয়ার্কের একটি প্রেরক থেকে ডেটা প্রেরণ করলে ঐ নেটওয়ার্কের শুধুমাত্র সিলেক্টেড প্রাপকসমূহ সেই ডেটা গ্রহণ করবে, ডেটা ট্রান্সমিশনের এরুপ মোডকে বলা হয় মাল্টিকাষ্ট। এই ট্রান্সমিশন সিস্টেমে নেটওয়ার্কের সকল প্রাপক ডেটা পাবে না। নিচের নেটওয়ার্কে শুধু একজন ডেটা পাঠাচ্ছে এবং অনেক জন ডেটা গ্রহন করছে কিন্তু সবাই নয়। যেমন: মোবাইল কনফারেন্স, অডিও , ভিডিও কনফারেন্স ইত্যাদি।

ডেটা কমিউনিকেশনে সাধারণত মাল্টিপয়েন্ট-টু-পয়েন্ট বা মাল্টিপয়েন্ট-টু-মাল্টিপয়েন্ট ট্রান্সমিশন করা হয় না। কারণ এতে ডেটার কলিশন বা সংঘর্ষ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-৪: ডেটা কমিউনিকেশনে তার মাধ্যম (টুইস্টেড পেয়ার, কো-এক্সিয়েল ও ফাইবার অপটিক ক্যাবল)।

ডেটা কমিউনিকেশনের মাধ্যম: ডেটা আদান-প্রদানের জন্য প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন হয়। এই সংযোগকে চ্যানেল বা মাধ্যম বলে। এই মাধ্যম দুই ধরণের হতে পারে। যেমন:

১। গাইডেড মিডিয়া বা তার মাধ্যম বা ক্যবল মাধ্যমঃ তার মাধ্যম আবার তিন ধরণের। যেমন:

- ক) টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted Pair Cable)
- খ) কো-এক্সিয়েল ক্যাবল (Co-axial Cable)
- গ) অপটিক্যাল ফাইবার বা ফাইবার অপটিক ক্যাবল (Fiber Optic Cable)

২। আনগাইডেড মিডিয়া বা তারবিহীন মাধ্যমঃ তারবিহীন মাধ্যম আবার তিন ধরণের। যেমন:

- ক) রেডিও ওয়েব (Radio Wave)
- খ) মাইক্রোওয়েভ (Micro Wave)
- গ) ইনফ্রারেড (Infrared)

গাইডেড মিডিয়া বা তার মাধ্যম বা ক্যাবল মাধ্যমঃ

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলঃ টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ সিগন্যাল ট্রান্সমিট করার জন্য দুটি পরিবাহী কপার বা তামার তারকে একই অক্ষে পরস্পর সমভাবে পেঁচিয়ে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল তৈরি করা হয়। পেঁচানো তার দুটিকে পৃথক রাখার জন্য এদের মাঝে অপরিবাহী পদার্থ হিসেবে প্ল্যাস্টিকের আস্তরণ ব্যবহার করা হয়। তড়িৎ চৌম্বকীয় প্রভাব(EMI) ও রেডিও তরঙ্গের প্রভাব(RFI) দূর করার জন্য প্রতি জোড়া তারে প্রতি ইঞ্চিতে ৩টি পূর্ণ টুইস্ট বা প্যাচ থাকে। এই ধরনের ক্যাবলে সাধারণত মোট ৪ জোড়া তার ব্যবহার করা হয়। ৪ জোড়া তারের প্রতি জোড়ায় একটি কমন (সাদা) রঙের তার এবং একটি ভিন্ন রঙের (কমলা, সবুজ, নীল, বাদামী) তার থাকে। কালার কোডিংএর জন্য প্রতি জোড়ায় একটি সাদা ও অন্য একটি ভিন্ন রঙের তার থাকে। ক্রশটক কমানোর জন্য চার জোড়া তারে মিটার প্রতি টুইস্টের সংখ্যা ভিন্নতা থাকে। RJ45 কানেক্টর দিয়ে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের কানেকশন দেওয়া হয়।

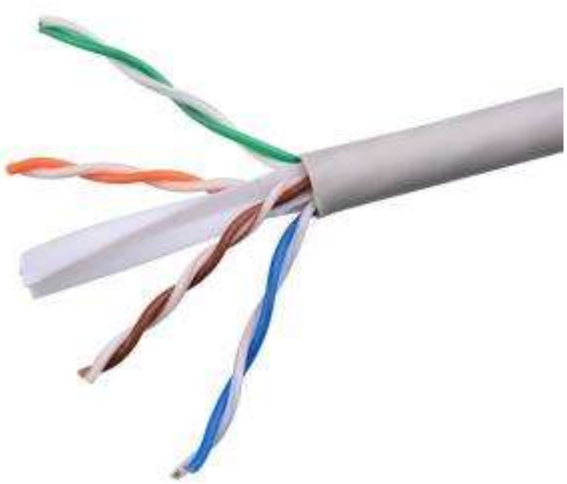

শিল্ডের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল দুই প্রকার। যথাঃ

১। ইউটিপি (Unshielded Twisted Pair-UTP): আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলে ডেটাকে নয়েজ থেকে সুরক্ষার জন্য প্রতি জোড়া তার এলুমিনিয়াম ফয়েল ও প্রটেকটিভ কপার শিল্ডিং দ্বারা আবৃত থাকে না।

- ব্যান্ডউইথ : ১০ Mbps
- ট্রান্সমিশন ডিসটেন্স : ১৫৫ মিটার (রিপিটার ছাড়া)

২। এসটিপি (Shielded Twisted Pair-STP): শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলে ডেটাকে নয়েজ থেকে সুরক্ষার জন্য প্রতি জোড়া তার এলুমিনিয়াম ফয়েল ও প্রটেকটিভ কপার শিল্ডিং দ্বারা আবৃত থাকে।

- ব্যান্ডউইথ : ১৬ Mbps তবে ৫০০ Mbps হতে পারে
- ট্রান্সমিশন ডিসটেন্স : ১০০ মিটার

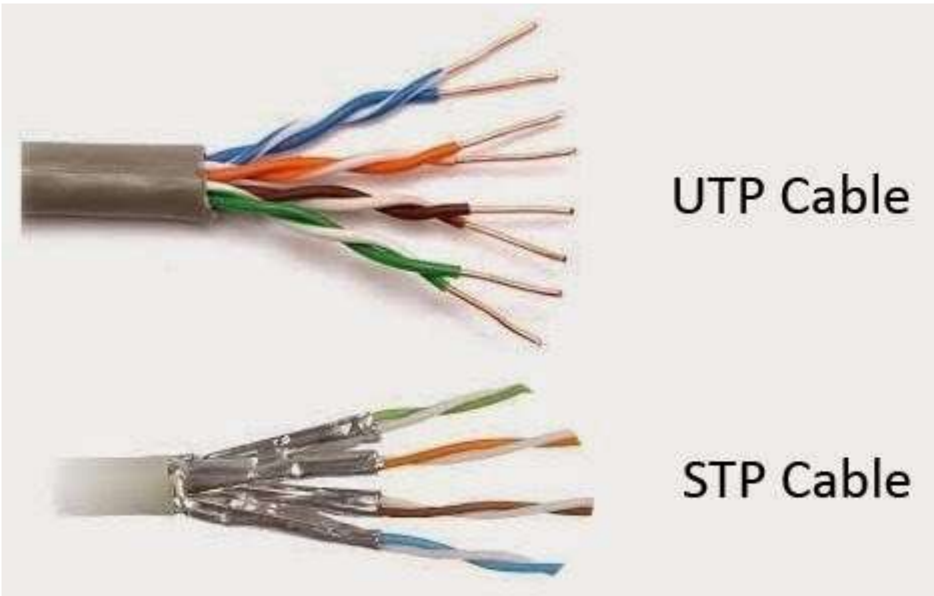

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের সুবিধাসমূহ:

- ১। টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল দামে খুবই সস্তা এবং ইনস্টল করাও সহজ।
- ২। অ্যানালগ এবং ডিজিটাল উভয় ডেটা ট্রান্সমিশনে এ ক্যাবল ব্যবহৃত হয়।
- ৩। কম দূরত্বে যোগাযোগ করার জন্য এই ক্যাবল অত্যাধিক ব্যবহৃত হয়।

টুইস্টেড পেয়ার কেবলের অসুবিধাসমূহ:

- ১। এ ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করে ১০০ মিটারের বেশি দূরত্বে ডেটা প্রেরণ করা কষ্টকর।
- ২। ট্রান্সমিশন লস অনেক বেশি হয়ে থাকে।

টুইস্টেড পেয়ার কেবলের ব্যবহার:

- ১। টেলিফোন লাইনে এই ক্যাবল ব্যবহৃত হয়।
- ২। LAN এর ক্ষেত্রে অত্যাধিক ব্যবহৃত হয়।

কো-এক্সিয়েল ক্যাবলঃ দুটি বিদ্যুৎ পরিবাহী ও অপরিবাহী স্তরের সাহায্যে এ ক্যাবল তৈরি করা হয়। এই ক্যাবলে দুটি বিদ্যুৎ পরিবাহী স্তর একই অক্ষ বরাবর থাকে বলে একে কো-এক্সিয়াল ক্যাবল বলা হয়। ভেতরের পরিবাহী তারটি কপার ওয়্যার যার মধ্য দিয়ে তড়িৎ সিগন্যাল প্রবাহিত হয়। ভেতরের পরিবাহী ও বাইরের পরিবাহী তারকে পৃথক রাখার জন্য এদের মাঝখানে অন্তরক পদার্থ হিসেবে ফোমের ইন্সুলেশন ব্যবহার করা হয় এবং বাইরের পরিবাহী তারকে প্লাস্টিকের জ্যাকেট দ্বারা ডেকে রাখা হয়। সাধারনত BNC কানেক্টর দিয়ে এই ধরণের ক্যাবল কানেকশন দেওয়া হয়।

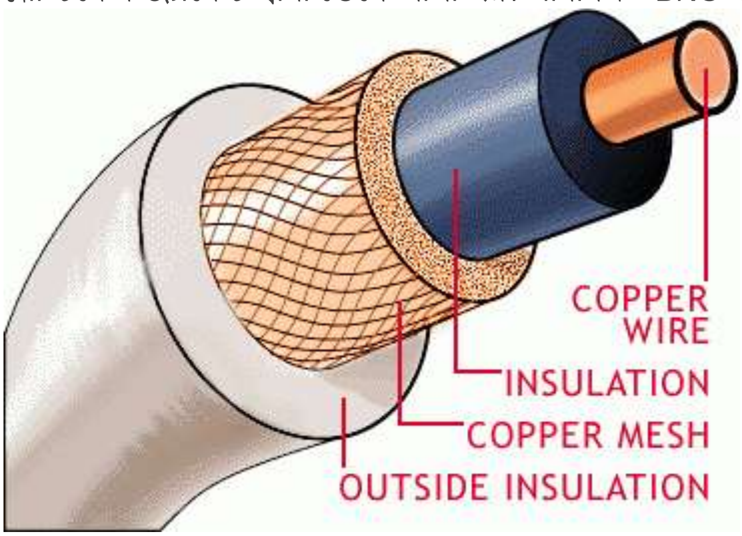

কো-এক্সিয়েল ক্যাবলের অংশ সমূহঃ

- **কপার ওয়্যার:** এর মধ্য দিয়ে ডেটা প্রবাহিত হয়।
- **ফোমের ইনসুলেশন:** কপার ওয়্যার যাতে বেঁকে বা কুঁচকে না যায় সেজন্য ব্যবহৃত হয়।
- **কপার মেস:** বাইরের তাপ, চাপ ও EMI থেকে কপার ওয়্যারকে রক্ষা করে যাতে নির্বিঘ্নে ডেটা চলাচল করতে পারে অর্থাৎ ইহা ভিতরের তারে প্রেরিত উপান্ত সিগনালের ব্যাতিচার রোধ করে।
- **আউট সাইড ইনসুলেশন:** তার যাতে বাহিরের আঘাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য প্ল্যাস্টিকের জ্যাকেট ব্যবহৃত হয়।

কো-এক্সিয়েল ক্যাবল দুই প্রকার। যথাঃ

থিননেট(thinnet):

- পুরুত্ব : ০.২৫ ইঞ্চি
- ট্রান্সমিশন ডিসটেন্স : ১৮৫ মিটার (রিপিটার ছাড়া)
- ট্রান্সমিশন স্পীড : ১০Mbps

থিকনেট(thicknet):

- পুরুত্ব : ০.৫ ইঞ্চি
- ট্রান্সমিশন ডিসটেন্স : 500 মিটার(রিপিটার ছাড়া)
- ট্রান্সমিশন স্পীড : ১০Mbps

কো-এক্সিয়াল ক্যাবেলের সুবিধাসমূহ:

- ১। এই ধরনের ক্যাবলের ট্রান্সমিশন লস অপেক্ষাকৃত কম হয়।
- ২। ডেটা স্থানান্তরের গতি বেশি।
- ৩। অ্যানালগ এবং ডিজিটাল উভয় ডেটা ট্রান্সমিশনে এ ক্যাবল ব্যবহৃত হয়।
- ৪। টুইস্টেড পেয়ার কেবল অপেক্ষা এ ক্যাবলের মাধ্যমে অধিক দূরত্বে তথ্য পাঠানো যায়।
- ৫। এটি ফাইবার অপটিক ক্যাবল অপেক্ষা কম ব্যয়বহুল এবং সহজে বহনযোগ্য।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের অসুবিধাসমূহ:

- ১। ডেটা ট্রান্সফার রেট নির্ভর করে তারের দৈর্ঘ্যের উপর।

- ২। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল অপেক্ষা কিছুটা ব্যয়বহুল।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের ব্যবহারঃ

- ১। টেলিভিশন নেটওয়ার্ক
- ২। ডিশ টিভি বা ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক
- ৩। সিসি টিভি নেটওয়ার্ক
- ৪। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে বহুল ব্যবহৃত হয়।

ফাইবার অপটিক ক্যাবল: এই ক্যাবল কতোগুলো ফাইবারের সমন্বয়ে তৈরি। ফাইবারগুলো কাঁচ অথবা প্লাস্টিকের তৈরি এক ধরনের ডাই-ইলেকট্রিক (অন্তরক) পদার্থ দ্বারা তৈরি,যা আলো পরিবহনে সক্ষম। অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে অতি দ্রুত ডেটা প্রেরণ করা যায়। অপটিক্যাল ফাইবারের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এটি ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের পরিবর্তে আলোক বা লাইট সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে। অপটিক্যাল ফাইবার কাঁচের তন্তু হওয়ায় তড়িৎ চৌম্বক প্রভাব হতে মুক্ত। বর্তমানে যেসব অপটিক্যাল ফাইবার পাওয়া যায় তার ডেটা ট্রান্সমিশন হার ১০০ mbps থেকে ২ gbps। SC-কানেক্টর, ST-কানেক্টর, MT-RJ-কানেক্টর এর সাহায্যে ডিভাইসের সাথে কানেকশন দেওয়া হয়।

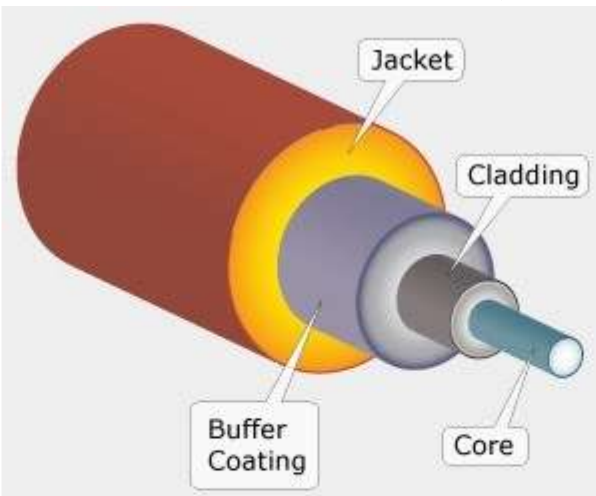

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের বিভিন্ন অংশ:

কোর: ভিতরের ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থ যা প্রধানত সিলিকা, প্লাস্টিক ও অন্যান্য উপাদানের মিশ্রনে তৈরি হয়ে থাকে। যার ব্যাস ৮-১০০ মাইক্রন হয়ে থাকে।

ক্ল্যাডিং: কোরকে আবদ্ধ করে রাখা বাইরের ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থ যা আলোর প্রতিফলন করতে পারে।

বাফারঃ তন্তুকে বাইরের পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে।

জ্যাকেট: এক বা একাধিক তন্তুকে ক্যাবলের মধ্যে ধারণ করে।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের প্রকারভেদঃ

কোরের গঠন অনুসারে ফাইবার অপটিক ক্যাবল দু ধরণের। যথাঃ

1. সিঙ্গেলমোড ফাইবার অপটিক ক্যাবল
2. মাল্টিমোড ফাইবার অপটিক ক্যাবল

সিঙ্গেলমোড ফাইবার অপটিক ক্যাবলঃ এই ক্যাবলে একসাথে কেবল একটি আলোক সংকেত প্রেরণের পথ থাকে। কোরের ব্যাস ৮-১০ মাইক্রোন হয়ে থাকে। দীর্ঘ দূরত্বে ডেটা পাঠানোর ক্ষেত্রে উপযোগী। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও টেলিফোন কম্পানিতে ব্যবহৃত হয়।

মাল্টিমোড ফাইবার অপটিক ক্যাবলঃ এই ক্যাবলে একসাথে একাধিক আলোক সংকেত প্রেরণের পথ থাকে। কোরের ব্যাস ৫০-১০০ মাইক্রোন হয়ে থাকে। সল্প দূরত্বে ডেটা পাঠানোর ক্ষেত্রে উপযোগী। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে ডেটা এবং অডিও/ভিডিও এর প্রেরণ ব্যবহৃত হয়।
মাল্টিমোড ফাইবার অপটিক ক্যাবল আবার দুই প্রকার। যথাঃ

1. **স্টেপ ইনডেক্স মাল্টিমোডঃ** কোরের প্রতিসরাঙ্ক সর্বত্র সমান হয়।
2. **গ্রেডেড ইনডেক্স মাল্টিমোডঃ** কোরের প্রতিসরাঙ্ক কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে কমতে থাকে।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের বৈশিষ্ট্য:

- ১। অত্যধিক উচ্চ গতিতে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে।
- ২। এটি ইলেক্ট্রিক্যাল সিগনালের পরিবর্তে আলোক বা লাইট সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে।
- ৩। অতি স্বচ্ছতা।
- ৪। রাসায়নিক সুস্থিরতা বা নিষ্ক্রিয়তা
- ৫। এতে আলোকের পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন পদ্ধতিতে ডেটা উৎস থেকে গন্তব্যে গমন করে।
- ৬। শক্তির অপচয় রোধ।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সুবিধা:

- ১। আয়তনে ছোট, ওজনে হালকা ও সহজে পরিবহনযোগ্য।
- ২। সহজে প্রক্রিয়াকরণ করা যায়।
- ৩। শক্তির অপচয় কম।
- ৪। বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাব হতে মুক্ত।
- ৫। ডেটা আদান-প্রদান নির্ভুল।
- ৬। পরিবেশের তাপ-চাপ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
- ৭। ডেটা সংরক্ষণের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা সবচেয়ে বেশি।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের অসুবিধা:

- ১। ফাইবার অপটিক ক্যাবলকে U আকারে বাঁকানো যায় না।
- ২। ফাইবার অপটিক ক্যাবল অত্যন্ত দামি।
- ৩। ফাইবার অপটিক ক্যাবল ইনস্টল করা অন্যান্য ক্যাবলের চেয়ে তুলনামূলক কঠিন।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের ব্যবহার:

- ১। নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন হিসেবে ফাইবার অপটিক ক্যাবল অধিক ব্যবহৃত হয়।
- ২। বর্তমানে ফাইবার অপটিক ক্যাবলের মাধ্যমে আলোকসজ্জা, সেন্সর ও ছবি সম্পাদনের কাজ করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-৫: তারবিহীন মাধ্যম(রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড)।

তারবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্য আদান-প্রদানের জন্য যে মাধ্যম ব্যবহৃত হয় তাকেই তারবিহীন মাধ্যম বলে। তারবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থায় তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে তথ্যের আদান-প্রদান করা হয়। এই ক্ষেত্রে অ্যান্টেনা (Antenna) ডেটা আদান-প্রদানে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ এক ধরণের আলোক রশ্মি। তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সম্পূর্ণ রেঞ্জকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম (তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গগুচ্ছ) বলা হয়। এই স্পেকট্রামের ক্ষুদ্র অংশ আমরা খালি চোখে দেখতে পাই, যা আলো নামে পরিচিত। সম্পূর্ন স্পেকট্রামকে বৈশিষ্ট্য অনুসারে কতোগুলো ছোট ছোট রেঞ্জে বিভক্ত করে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। যথাঃ বেতার তরঙ্গ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড, আলোক রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি, এক্স-রে ও গামা রশ্মি।

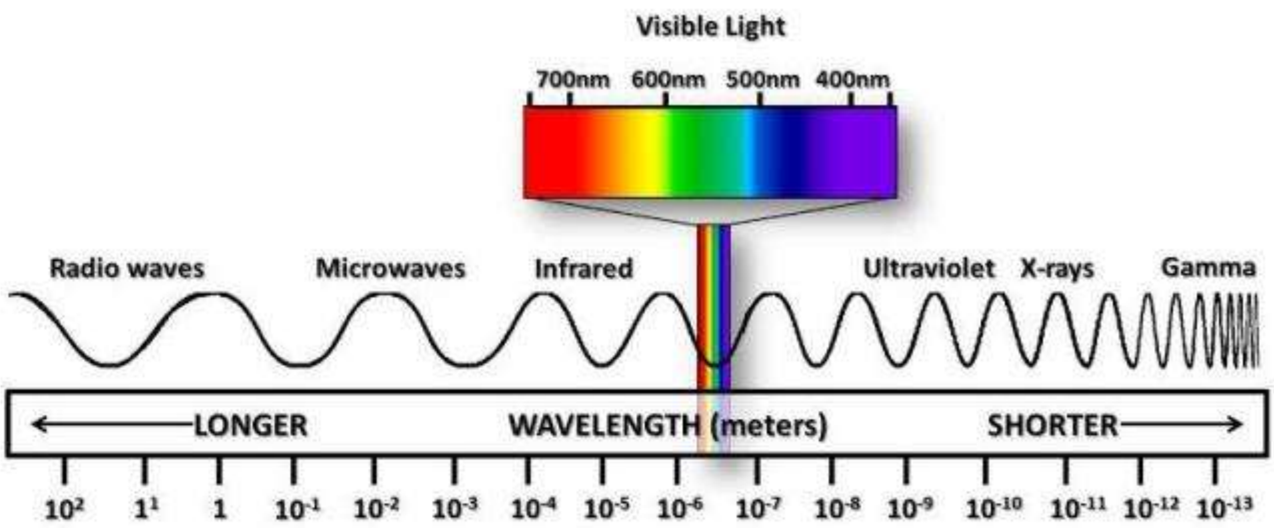

তারবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থায় নিচের তিন ধরণের তরঙ্গ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যথাঃ

- ১। বেতার তরঙ্গ (Radio Wave)
- ২। মাইক্রোওয়েভ (Microwave)
- ৩। লোহিত আলোক রশ্মি (Infrared)

উপরের তরঙ্গের সাহায্যে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ও পয়েন্ট-টু-মাল্টিপয়েন্ট যোগাযোগ করা যায়। এই ক্ষেত্রে দুই ধরণের অ্যান্টেনা ব্যবহৃত হয়।

1. ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা
2. রিসিভার অ্যান্টেনা

ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা তড়িৎ সিগন্যালকে তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গে রূপান্তর করে যা বায়ু, পানি ও মহাশূন্য দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। রিসিভার অ্যান্টেনা তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গকে তড়িৎ সিগন্যালে রূপান্তর করে।

সিগন্যাল কীভাবে প্রেরণ বা গ্রহণ করে তার উপর ভিত্তি করে অ্যান্টেনা দুই ধরণের। যথাঃ

1. দিকযুক্ত অ্যান্টেনা (Directional Antena)
2. দিকবিহীন অ্যান্টেনা (Omni Directional Antena)

দিকযুক্ত অ্যান্টেনা (Directional Antena): এই ধরণের ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা তরঙ্গকে টর্চলাইটের আলোর মত একদিকে প্রেরণ করে এবং রিসিভার অ্যান্টেনা ঐ তরঙ্গ গ্রহণের জন্য মুখোমুখি(Line of Sight) অবস্থানে থাকতে হয়।
দিকবিহীন অ্যান্টেনা (Omni Directional Antena): এই ধরণের ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা তরঙ্গকে বাল্বের আলোর মত চারদিকে প্রেরণ করে এবং রিসিভার অ্যান্টেনা ঐ তরঙ্গ সবদিক থেকেই গ্রহণ করতে পারে।

রেডিও ওয়েভ: 3KHz হতে 300GHz ফ্রিকোয়েন্সির ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে বলা হয় রেডিও ওয়েভ। এই তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 1mm থেকে 100km পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সি সাধারণত বেতার যোগাযোগে ব্যবহৃত হয় বলে একে রেডিও ওয়েভ বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি কম্পিউটার একই ফ্রিকুয়েন্সিতে সেট করা থাকে যাতে এগুলো অন্য কম্পিউটার থেকে সিগনাল গ্রহন করতে পারে। সাধারণত ডেটা কমিউনিকেশনে 10KHz থেকে 1GHz ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও স্পেকট্রাম ব্যবহৃত হয়। রেডিও ওয়েভ দুই ধরণের। একটি হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত, অন্যটি হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত রেডিও ওয়েভ সরকারের অনুমতি ছাড়া কেউ ব্যবহার করতে পারে না।
রেডিও ওয়েভ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা:-
লো-পাওয়ার সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি: শুধু একটি ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে যা ৭০ মিটার বা ২৩০ ফুটের মধ্যে ট্রান্সমিশন উপযোগী। ট্রান্সমিশন গতি ১ থেকে ১০ এমবিপিএস।
হাই-পাওয়ার সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি: অনেক বেশী জায়গা পর্যন্ত সিগনাল পাঠানো যায়। চলার পথে কোনো বাধা থাকলে তা ভেদ করতে সক্ষম। ট্রান্সমিশন গতি ১ থেকে ১০ এমবিপিএস।
স্প্রেড স্পেকট্রাম: সিঙ্গেল ফ্রিকুয়েন্সি ট্রান্সমিশনে কেবল একটি ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করা হয়, আর স্প্রেড স্পেকট্রাম রেডিও ট্রান্সমিশনে একাধিক ফিকুয়েন্সি ব্যবহার করা হয়।
রেডিও ওয়েভ এর ব্যবহারঃ

- ১। রেডিও বা বেতার যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়।
- ২। মোবাইল যোগাযোগের লিংক স্থাপনে।
- ৩। টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং।
- ৪। ইন্টারনেট সংযোগের জন্য টাওয়ার টু টাওয়ার রেডিও লিংক ব্যবহার করা হয়।

রেডিও ওয়েভ এর সুবিধাঃ

1. রেডিও ওয়েব বিল্ডিং বা দেয়াল ভেদ করতে পারে।
2. কোন প্রকার ক্যাবল দরকার হয় না।
3. ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার একই সরল রেখায় থাকার প্রয়োজন নেই।
4. রেডিও ওয়েব বায়ুমণ্ডল দ্বারা শোষিত হয় না, ফলে বায়ুমণ্ডল দ্বারা সামান্যই প্রভাবিত হয়।

রেডিও ওয়েভ এর অসুবিধাঃ

1. রেডিও ওয়েব ট্রান্সমিশনে নিম্নসীমার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহৃত হয়, বিপুল পরিমাণ তথ্য একসাথে প্রেরণ করা সম্ভব হয় না।
2. রেডিও ওয়েব সাস্থের জন্য ক্ষতিকর।

মাইক্রোওয়েভ: 300MHz হতে 300GHz ফ্রিকোয়েন্সির ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে বলা হয় মাইক্রোওয়েভ। এই তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 1mm থেকে 1m পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাইক্রোওয়েভ বাঁকা পথে চলতে পারে না। মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম মূলত দুটো ট্রান্সসিভার নিয়ে গঠিত। এর একটি সিগন্যাল ট্রান্সমিট এবং অন্যটি রিসিভ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু মাইক্রোওয়েভ বাঁকা পথে চলতে পারে না তাই ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার মুখোমুখি থাকতে হয়। মাইক্রোওয়েভের অ্যান্টেনা কোনো ভবন বা টাওয়ারের উপর বসানো হয় যাতে সিগন্যাল বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এবং পথে কোনো বস্তু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে। অধিক দূরত্বের যোগাযোগে মাইক্রোওয়েভ অত্যন্ত জনপ্রিয়। মাইক্রোওয়েভ মাধ্যম ব্যবহার করে ডেটা, ছবি, শব্দ স্থানান্তর করা সম্ভব।
মাইক্রোওয়েভের বৈশিষ্ট্যঃ

- ১। মাইক্রোওয়েভ বাঁকা পথে চলতে পারে না।
- ২। মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম মূলত দুটো ট্রান্সসিভার নিয়ে গঠিত। এর একটি সিগন্যাল ট্রান্সমিট এবং অন্যটি রিসিভ করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

- ৩। মাইক্রোওয়েভ মাধ্যমে প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে কোনো বাধা থাকলে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে না।
- ৪। মাইক্রোওয়েভের এন্টিনা বড় কোনো ভবন বা টাওয়ারের উপর বসানো হয় যাতে সিগন্যাল বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

মাইক্রোওয়েভ দুই প্রকার। যথাঃ

- ১। টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ
- ২। স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ

টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ: এই ধরণের প্রযুক্তিতে ভূপৃষ্টেই ট্রান্সমিটার ও রিসিভার বসানো হয়। ট্রান্সমিটার ও রিসিভার দৃষ্টি রেখায় যোগাযোগ করে। কোনো বাধা না থাকলে ১ থেকে ৫০ মাইল পর্যন্ত ডেটা চলাচল করতে পারে।

স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ: এক্ষেত্রে সিগনাল পাঠানোর জন্য ভূ-পৃষ্ঠে থাকে স্যাটেলাইট এন্টেনা এবং মহাশুণ্যে তাকে স্যাটেলাইট। স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ মহাকাশে থেকে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ বলের কারণে পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। সৌরশক্তি ব্যবহারের কারণে উপগ্রহ মহাকাশে রাখতে জ্বালানি বা শক্তি খরচ করতে হয় না। স্যাটেলাইটের মৌলিক উপাদানগুলো হল প্রাপক এন্টেনা, প্রেরক এন্টেনা ও ট্রান্সপন্ডার। পৃথিবীতে অবস্থিত স্টেশনগুলোতে শক্তিশালী এন্টেনা থাকে যার নাম VSAT(Very Small Aperture Terminal)। ট্রান্সমিটারগুলো স্যাটেলাইটকে মাইকোওয়েভ সিগন্যাল প্রেরণ করে। স্যাটেলাইটে পাঠানোর পর এই সংকেত অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ে। স্যাটেলাইটে অনেকগুলো ট্রান্সপন্ডার থাকে যা ক্ষীণ সংকেতকে অ্যামপ্লিফাই করে পৃথিবীর গ্রাহক যন্ত্রে পাঠায়। VSAT এন্টেনাগুলো সবসময় স্যাটেলাইটের দিকে রাখতে হয়। স্যাটেলাইটগুলো অনেক দূরে অবস্থিত থাকার কারণে অধিক শক্তিতে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করতে হয়। মহাশুণ্যে অবস্থিত স্যাটেলাইট ও ভু-পৃষ্ঠের ডিশ এন্টনার মধ্যে দুরত্ব প্রায় ৫০, ০০০ কি.মি।

স্যাটেলাইটের ব্যবহারঃ

- ১। টেলিভিশন সিগন্যাল পাঠানোর কাজে।
- ২। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে।
- ৩। ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে।
- ৪। আবহাওয়ার সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণে ।

মাইক্রোওয়েবের সুবিধাঃ

1. ব্যান্ডউইথ অনেক বেশি তাই এটি ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ তথ্য একইসাথে ট্রান্সমিট করা যায়।
2. কোন প্রকার ক্যাবল ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।
3. পাহাড়ি ও দূরবর্তী অঞ্চলে যোগাযোগের জন্য এটি সুবিধাজনক।

মাইক্রোওয়েবের অসুবিধাঃ

1. মাইক্রোওয়েভ বাঁকা পথে চলতে পারে না।
2. মাইক্রোওয়েভ মাধ্যমে প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে কোনো বাধা থাকলে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে না।

ইনফ্রারেডঃ 300GHz হতে 400THz ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে বলা হয় ইনফ্রারেড। এই তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 750nm থেকে 1mm পর্যন্ত হয়ে থাকে। খুবই নিকটবর্তী দুটি ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগে ব্যবহৃত হয়।

ইনফ্রারেডের সুবিধাঃ

- ১। দামে সস্তা।
- ২। বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন কম।
- ৩। স্বল্প দুরুতে (প্রায় ১০ মিটার) ভালো কাজ করে।

ইনফ্রারেডের অসুবিধাঃ

- ১। অধিক দূরুতে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে না।
- ২। ট্রান্সমিটার ও রিসিভারের মধ্যে কোন প্রতিবন্দক থাকলে কাজ করে না।

ইনফ্রারেডের ব্যবহারঃ

- ১। রেডিও, টিভি, এসি ইত্যাদির রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমে।
- ২। কম্পিউটারের তারবিহীন কিবোর্ড, মাউস, প্রিন্টার ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার কাজে।

তারবিহীন মাধ্যমের গুরুত্ব:

দূরবর্তী ও দূর্গম স্থানসমূহের মধ্যে ডেটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে তারবিহীন মাধ্যম উপযোগী। বহনযোগ্য ডিভাইসের (মোবাইল, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট ইত্যাদি) মধ্যে ডেটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে তারবিহীন মাধ্যম ব্যবহার বেশি উপযোগী।

দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-৬: ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম।

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমঃ একাধিক ডিভাইসের মধ্যে কোন ফিজিক্যাল সংযোগ ব্যতীত ডেটা ট্রান্সফার করার পদ্ধতি হলো ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম। এই সিস্টেমের সাহায্যে রিমোট কন্ট্রোল, মাউস, কি-বোর্ড, হেডফোন, স্পিকার, প্রিন্টার, মোবাইল ফোন, রেডিও ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তাঃ

- ১। নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত যেকোন স্থানে ওয়্যারলেস ডিভাইস সহজে বহন করা যায়।
- ২। দূর্গম এলাকায় যেখানে তার সংযোগ সম্ভব নয় সেখানে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমের সুবিধাঃ

- ১। বহনযোগ্য ডিভাইসের ক্ষেত্রে সংযোগ পদ্ধতি সহজ।
- ২। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমে নয়েজ এর প্রভাব খুবই কম।
- ৩। তার মাধ্যমের তুলনায় ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমের সাহায্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন সহজ।

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমের অসুবিধাঃ

- ১। তারযুক্ত নেটওয়ার্কের তুলনায় গতি কম।
- ২। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রযুক্তি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
- ৩। প্রতিবন্ধক অনেকসময় ডেটা চলাচলের ক্ষেত্রে বাধা সৃস্টি করে।

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে দুই ধরণের অ্যাকসেস পয়েন্ট ব্যবহৃত হয়। যথাঃ

- ১। মোবাইল নেটওয়ার্ক (Mobile Network)
- ২। হটস্পট (Hotspot)

হটস্পট(Hotspot): হটস্পট হচ্ছে এক ধরনের ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক। হটস্পট তৈরির জন্য জনপ্রিয় তিনটি প্রযুক্তি-

- ব্লু-টুথ (Bluetooth)
- ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)
- ওয়াইম্যাক্স (WiMAX)

ব্লু-টুথ (Bluetooth): ব্লুটুথ হচ্ছে একটি ওয়্যারলেস প্রযুক্তি যার মাধ্যমে একটি ওয়্যারলেস পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (WPAN) তৈরি করা যায়। এর কভারেজ এরিয়া সাধারণত ১০ থেকে ১০০ মিটার হয়ে থাকে। বর্তমানে প্রায় সকল ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ব্লুটুথ বিল্ট-ইন থাকে। তবে বিভিন্ন ডিভাইসে USB পোর্টের মাধ্যমেও ব্লুটুথ সংযোগ দেওয়া যায়। ১৯৯৪ সালে টেলিকম ভেন্ডর এরিকসন ব্লুটুথ উদ্ভাবন করে। দশম শতাব্দির ডেনমার্কের রাজা হারাল্ড ব্লুটুথ এর নামানুসারে এ প্রযুক্তিটির নাম রাখা হয়েছে ব্লুটুথ।

ব্লুটুথের বৈশিষ্ট্য:

- ১। ব্লুটুথ IEEE 802.15.1 স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তি।
- ২। স্বল্প দূরত্বে দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডেটা স্থানান্তরে ব্লুটুথ ২.৪ গিগাহার্টজ (GHz) ফ্রিকুয়েন্সির রেডিও ওয়েব ব্যবহার করে।
- ৩। এর ডেটা ট্রান্সমিশন রেট প্রায় 1Mbps বা তারচেয়ে বেশি।

- ৪। ব্লুটুথ একটি পিকোনেট(ব্লুটুথ দিয়ে তৈরি নেটওয়ার্কে পিকোনেট বলে) এর আওতায় সর্বোচ্চ ৮টি যন্ত্রের সাথে সিগন্যাল আদান-প্রদান করতে পারে। এর মধ্যে একটি মাস্টার ডিভাইস এবং বাকিগুলো স্লেভ ডিভাইস হিসেবে কাজ করে। অনেকগুলো পিকোনেট মিলে আবার স্ক্যাটারনেট গঠিত হতে পারে।
- ৫। ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হাফ-ডুপ্লেক্স।

ব্লুটুথের ব্যবহার:

- ১। ফোনের সাথে হ্যান্ডস ফ্রি হেডসেটের সংযোগ সাউন্ড বা ভয়েস ডেটা স্থানান্তরে ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।
- ২। ফোন থেকে কম্পিউটারে ফাইল স্থানান্তরে এ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।
- ৩। ব্লুটুথ ব্যবহার করে কম্পিউটারের সাথে অন্যান্য ডিভাইসের সংযোগ ঘটানো যায় এবং তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।
- ৪। পিসির ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসগুলোর সাথে তারবিহীন যোগাযোগে ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।
- ৫। জিপিএস রিসিভার, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, বারকোড স্ক্যানার ও ট্রাফিক কন্ট্রোল ডিভাইসগুলোতে ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়
- ৬। ডেডিকেটেড টেলিহেলথ ডিভাইসগুলোতে হেলথ সেন্সর ডেটাগুলোর শর্ট রেঞ্জ ট্রান্সমিশনে ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।
- ৭। প্রায়ই ইনফ্রারেড ব্যবহৃত হয় এমন স্থানে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।

ওয়াই-ফাই(Wi-Fi): Wi-Fi শব্দটি Wireless Fidelity শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ওয়াই-ফাই হলো জনপ্রিয় একটি তারবিহীন নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তি যা রেডিও ওয়েব ব্যবহার করে থাকে। এর এরিয়া একটি কক্ষ, একটি ভবন কিংবা সাধারণত ইনডোরের ক্ষেত্রে এ দূরত্ব ৩২ মিটার এবং আউটডোরের ক্ষেত্রে ৯৫ মিটারের মতো এলাকা জুড়ে হতে পারে। ওয়াই-ফাই এনাবল্ড কোনো ডিভাইস যেমন- একটি পার্সোনাল কম্পিউটার, ভিডিও গেম কনসোল, স্মার্টফোন কিংবা ডিজিটাল অডিও প্লেয়ার প্রভৃতি একটি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক অ্যাকসেস পয়েন্টের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হতে পারে।

ওয়াই-ফাই এর বৈশিষ্ট্য:

- ১। ওয়াই-ফাই IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তি।
- ২। ওয়াই-ফাই রেডিও ওয়েব ব্যবহার করে থাকে।
- ৩। ওয়াই-ফাই প্রযুক্তির ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হাফ-ডুপ্লেক্স।

ওয়াই-ফাই এর সুবিধা:

- ১। Wi-Fi প্রযুক্তি ব্যবহার করে একই সাথে একাধিক কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া যায়।
- ২। নেটওয়ার্কের জন্য কোনো লাইসেন্স বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।
- ৩। নেটওয়ার্ক সহজে নতুন ব্যবহারকারী যুক্ত করে নেটওয়ার্কের পরিধি বাড়ানো যায়।
- ৪। ওয়াই-ফাই লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের তুলনায় তুলনামূলকভাবে সস্তা এবং খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়।

ওয়াই-ফাই এর অসুবিধা:

- ১। Wi-Fi নেটওয়ার্কের সীমানা নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।
- ২। নেটওয়ার্কের দক্ষতা ও গতি তুলনামূলকভাবে কম।
- ৩। বিদ্যুৎ খরচ অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ডের তুলনায় বেশি।
- ৪। অন্যান্য ডিভাইস কর্তৃক সিগন্যাল জ্যাম বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে।
- ৫। ডেটা ও নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ঝুঁকি থেকে যায়।
- ৬। দূরত্ব বেশি হলে নেটওয়ার্কের গতি ও সিগন্যালের গুণগত মান উল্লেখযোগ্যহারে কমে যেতে পারে।
- ৭। অজ্ঞাত বা অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক অ্যাক্সেস পয়েন্ট ব্যবহারের ঝুঁকি থাকে।

ওয়াইম্যাক্স(WiMAX): WiMAX এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Worldwide Interoperability for Microwave Access। ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তির মাধ্যমে উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড সেবা, তারবিহীন ব্যবস্থায় বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ইন্টারনেট অ্যাকসেস করার সুযোগ পাওয়া যায়।WiMAX এর দুটি প্রধান অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে WiMAX এর বেস স্টেশন যা ইনডোর ও আউটডোর টাওয়ার নিয়ে গঠিত। অন্যটি হচ্ছে এন্টিনাসহ WiMAX রিসিভার, যা কোনো কম্পিউটার বা

ল্যাপটপে সংযুক্ত থাকে। একটি WiMAX বেস স্টেশন সাধারণত ১০ কিমি হতে শুরু করে ৬০ কিমি পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট অ্যাক্সেস সুবিধা দিয়ে থাকে।

ওয়াইম্যাক্স এর বৈশিষ্ট্যঃ

- ১। ওয়াইম্যাক্স IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তি।
- ২। এই প্রযুক্তিতে ডেটা ট্রান্সমিশন রেট 70Mbps।
- ৩। এই প্রযুক্তিতে মাইক্রোওয়েব ব্যবহৃত হয়।
- ৪। ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তির ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ফুল-ডুপ্লেক্স।

ওয়াইম্যাক্স এর সুবিধা:

- ১। কভারেজ এরিয়া সাধারণত ১০ কিমি হতে শুরু করে ৬০ কিমি পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- ২। একক একটি স্টেশনের মাধ্যমে হাজার হাজার ব্যবহারকারীকে ইন্টারনেট সেবা দেয়া যায়।
- ৩। ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড লাইসেন্স বা লাইসেন্সবিহীন উভয়ই হতে পারে।
- ৪। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সেবা পাওয়া যায়; এমনকি যেখানে ফোনের সংযোগ পৌঁছেনি সেখানেও।
- ৫। কোয়ালিটি অব সার্ভিসের নিশ্চয়তা দেয়।
- ৬। তথ্য ও টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সেবাগুলো প্রদান করা যায়।
- ৭। এন্টিনাসহ WiMAX রিসিভার, যা কোনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপে সংযুক্ত থাকে। ফলে পোর্টেবিলিটি সুবিধা পাওয়া যায়।

ওয়াইম্যাক্স এর অসুবিধা:

- ১। দূরত্ব বেশি হলে একাধিক বেজ স্টেশনের প্রয়োজন হয়।
- ২। নেটওয়ার্কের অন্যান্য ওয়্যারলেস ডিভাইস সিগন্যালে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।
- ৩। সংস্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি।
- ৪। অনেক ব্যবহারকারী একই টাওয়ার অ্যাক্সেস করায় সার্ভিসের সঠিক গুণগত মান বজায় রাখা অনেক ক্ষেত্রে কঠিন।
- ৫। অন্যান্য নেটওয়ার্ক যেমন- ফাইবার অপটিক, স্যাটেলাইট, ক্যাবল ইত্যাদির সাথে তুলনা করলে ওয়াইম্যাক্স এর ডেটা রেট অত্যন্ত ধীরগতির।
- ৬। খারাপ আবহাওয়া যেমন বৃষ্টির কারণে এর সিগন্যালে বিঘ্ন ঘটতে পারে।
- ৭। বেশি বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারকারী প্রযুক্তি যার ফলে সার্বিক নেটওয়ার্ক চালানোর জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-৭: মোবাইল যোগাযোগ।

সেলুলার ফোনের ইতিহাস শুরু হয় ১৯২০ সালে, মোবাইল রেডিও আবিষ্কারের পর। ১৯৪০ সালে **মার্টিন কুপার** মটোরলা (সিলিকন ভ্যালি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা) আধুনিক মোবাইল ফোন আবিষ্কার করেন। তাই তাকে মোবাইল ফোনের জনক বলা হয়। এই সময় হতে যুক্তরাষ্ট্রে মোবাইল ফোন শুরু হয়। পরে ১৯৫০ সালে ইউরোপ ও ২য় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালিন সময় যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সর্বপ্রথম মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু করে। ইংরেজী শব্দ থেকে মোবাইল ফোন শব্দটি এসেছে। শব্দটির বাংলা অর্থ সরানো, নাড়ানো, চলমান। তাই চলমান অবস্থায় তারবিহীন যে সকল ফোন ব্যবহার করা হয় তাকে মোবাইল ফোন বলে।

মোবাইল ফোন হলো এক ধরণের ইলেকট্রনিক ডিভাইস যার সাহায্যে সেলুলার নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উভয়মুখী বা দ্বিমুখী টেলিযোগাযোগ করা যায়। মোবাইল ফোনকে অনেক সময় সেলুলার ফোন, সেলফোন বা হ্যান্ড ফোনও বলা হয়।

দুটি চলনশীল ডিভাইস অথবা একটি চলনশীল ও অন্যটি স্থির ডিভাইসের মধ্যে ডেটা ও তথ্য আদান প্রদান করার লক্ষ্যে ডিজাইনকৃত সিষ্টেমকে মোবাইল টেলিফোন সিস্টেম বলে। চলমান ডিভাইসকে মোবাইল স্টেশন বা মোবাইল সেট এবং স্থির ডিভাইসকে Land Unit বলা হয়।

সেলুলার টেলিফোন হলো এক ধরণের শর্ট-ওয়েভ অ্যানালগ বা ডিজিটাল টেলিযোগাযোগ যেখানে কোনো গ্রাহকের একটি মোবাইল ফোন থেকে কাছাকাছি অবস্থিত কোন ট্রান্সমিটারের মধ্যে ওয়ারলেস সংযোগ থাকে। ট্রান্সমিটারের কভারেজ এরিয়াকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়। এর প্রতিটি ভাগকে বলে সেল। সেলুলার রেডিও সিষ্টেমে রেডিও সার্ভিসের সাথে ভূমি এলাকায় সিগনাল বা সংকেত সরবরাহ করা হয় যা নিয়মিত আকারের সেলে বিভক্ত। সেল ষড়ভুজাকার, বর্গাকার, বৃত্তাকার বা অন্য কোন অনিয়মিত আকারের হতে পারে। যদিও ষড়ভুজাকারই প্রথাগত।

সেল সিগন্যাল এনকোডিংঃ বিভিন্ন ট্রান্সমিটার থেকে প্রেরিত সিগন্যালগুলো আলাদা করার জন্য ব্যবহৃত এনকোডিং পদ্ধতিকে বলা হয় সেল সিগন্যাল এনকোডিং। সেল সিগন্যাল এনকোডিং এর প্রকারভেদঃ

- FDMA- Frequency Division Multiple Access
- TDMA- Time Division Multiple Access
- CDMA- Code Division Multiple Access

মোবাইল ফোন প্রযুক্তির প্রকারভেদঃ বর্তমানে প্রচলিত মোবাইল ফোন প্রযুক্তিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

1. GSM- Global System For Mobile Communication.
2. CDMA- Code Division Multiple Access.

জিএসএম (GSM): GSM হল TDMA (Time Division Multiple Access) এবং FDMA (Frequency Division Multiple Access) এর সম্মিলিত একটি চ্যানেল অ্যাকসেস পদ্ধতি। এই প্রযুক্তিতে মোবাইল ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে উচ্চগতির প্রযুক্তি GPRS(General Packet Radio Service) এবং EDGE(Enhanced Data Rate for GSM Evolution) ব্যবহৃত হয়।

জিএসএম (GSM) এর বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

1. সেল কভারেজ এরিয়া ৩৫ কি.মি.।
2. বিদ্যুৎ খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি(২ ওয়াট)।
3. ডেটা ট্রান্সফার রেট তুলনামূলক কম (৫৬kbps)।
4. আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা আছে।
5. ব্যবহৃত SIM কার্ড সহজলভ্য এবং যেকোন হ্যান্ডসেটে ব্যবহারের করা যায়।

সিডিএমএ (CDMA): এই প্রযুক্তিতে ডেটা পাঠানো হয় ইউনিক কোডিং পদ্ধতিতে। CDMA যে পদ্ধতিতে ডেটা আদান-প্রদান করে তাকে স্প্রেড স্পেকট্রাম বলা হয়। এটি একাধিক ব্যবহারকারীকে একই ফ্রিকোয়েন্সির ব্যান্ড শেয়ার করার সুবিধা দিয়ে থাকে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন কম হওয়ায় এই প্রযুক্তিকে গ্রীণফোন প্রযুক্তি বলা হয়। মোবাইল অপারেটর সিটিসেল এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

সিডিএমএ (CDMA) এর বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

1. সেল কভারেজ এরিয়া ১১০ কি.মি.।

2. বিদ্যুৎ খরচ তুলনামূলকভাবে কম।
3. ডেটা ট্রান্সফার রেট তুলনামূলক বেশি (154kbps-614 kbps)।
4. আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা নেই।
5. ব্যবহৃত RUIM কার্ড যেকোন হ্যান্ডসেটে ব্যবহারের করা যায়।

মোবাইল ফোনের বিভিন্ন প্রজন্মঃ মোবাইল ফোনের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ও উন্নয়নের এক একটি পর্যায় বা ধাপকে মোবাইল ফোনের প্রজন্ম নামে অবিহিত করা হয়। এ পর্যন্ত আবিস্কৃত মোবাইল ফোনের চারটি প্রজন্মে ভাগ করা যায়। নিচে এসব প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রথম প্রজন্ম (১৯৫০-১৯৮৯) :

- ১। এই প্রজন্মে এনালগ পদ্ধতির রেডিও সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়।
- ২। সেল সিগন্যাল এনকোডিং হলো FDMA।
- ৩। সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি তুলনামুলক কম।
- ৪। কথোপকথন চলা অবস্থায় ব্যবহারকারীর অবস্থানের পরিবর্তন হলে ট্রান্সমিশন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
- ৫। এতে মাইক্রোপ্রসেসর ও সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।
- ৬। একই এলাকায় অন্য মোবাইল ট্রান্সমিটারের দ্বারা সৃষ্ট রেডিও ইন্টারফারেন্স নেই।
- ৭। আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা চালু ছিলো না।

দ্বিতীয় প্রজন্ম (১৯৯০-২০০০) :

- ১। এই প্রজন্মে ডিজিটাল পদ্ধতির রেডিও সিগনাল ব্যবহৃত হয়।
- ২। সেল সিগন্যাল এনকোডিং হলো FDMA, TDMA, CDMA
- ৩। সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি এবং মাইক্রোওয়েভ ডিভাইসের অগ্রগতির ফলে মোবাইল কমিউনিকেশনে ডিজিটাল ট্রান্সমিশন সম্ভব হয়।
- ৪। উন্নত মানের অডিও এর জন্য ডিজিটাল মডুলেশন ব্যবহৃত হয়।
- ৫। ডেটা স্থানান্তরের গতি অনেক বেশী।
- ৬। ডেটার প্রতারনা রোধে সহায়তা করে।
- ৭। সর্বপ্রথম প্রিপেইড পদ্ধতি চালু হয়।
- ৮। সীমিতমাত্রায় আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা চালু হয়।
- ৯। মোবাইল ডেটা স্থানান্তরের জন্য প্যাকেট সুইচ নেটওয়ার্ক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
- ১০। এমএমএস(MMS) ও এসএমএস(SMS) সেবা কার্যক্রম চালু হয়।
- ১১। জিএসএম পদ্ধতিতে ডেটা ও ভয়েস প্রেরন করা সম্ভব হয়।
- ১২। কথোপকথন চলা অবস্থায় ব্যবহারকারীর অবস্থানের পরিবর্তন হলে ট্রান্সমিশন অবিচ্ছিন্ন থাকে।
- ১৩। ক্ষেত্র বিশেষে অন্য মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডারের ট্রান্সমিটারের দ্বারা সৃষ্ট রেডিও ইন্টারফারেন্স হয়।

তৃতীয় প্রজন্ম (২০০১-২০০৮):

- ১। ডেটা স্থানান্তরে প্যাকেট সুইচিং ও সার্কিট সুইচিং উভয় পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়। তবে প্যাকেই সুইচিং পদ্ধতির সাহায্যে খুব দ্রুত ছবি ও ভয়েস আদান প্রদান করা হয়।
- ২। মডেম সংযোজনের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটের ব্যবহার এবং ডেটা আদান প্রদানের নতুন এক মাত্রা যোগ হয়।
- ৩। EDGE পদ্ধতি কার্যকর হয়। ফলে অধিক পরিমান ডেটা স্থানান্তর হয়।
- ৪। ডেটা স্থানান্তরের গতি 2 Mbps এর অধিক।
- ৫। মোবাইল ব্যাংকিং, ই-কমার্স ইত্যাদি সেবা কার্যক্রম চালু হয়।
- ৬। আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা চালু হয়।

চতুর্থ প্রজন্ম (২০০৯-বর্তমান) :

- ১। 4G এর গতি 3G এর চেয়ে প্রায় 50 গুন বেশী। এর প্রকৃত ব্যান্ড উইথ 10 Mbps আশা করা হচ্ছে।
- ২। টেলিভিশনের অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের ছবি এবং ভিডিও লিংক প্রদান করবে।
- ৩। আইপি নির্ভর ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক সিস্টেম কাজ করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-৮: কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং।

নেটওয়ার্ক: দুই বা ততোধিক বস্তুকে কোন কিছুর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হলে উক্ত ব্যবস্থাকে বলে নেটওয়ার্ক।
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক: যখন দুই বা ততোধিক কম্পিউটার তার বা তারবিহীন মাধ্যমের সাহায্যে সংযুক্ত হয়ে তথ্য, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ইত্যাদি শেয়ার করে তখন উক্ত ব্যবস্থাকে বলা হয় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্যঃ
হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ারঃ একটি অফিসের পাঁচটি কম্পিউটারের জন্য পৃথক পাঁচটি প্রিন্টার সেটআপ করার পরিবর্তে কম্পিউটারগুলোর সমন্বয়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে একটি প্রিন্টার নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করলে নেটওয়ার্কের অধিনস্ত সকল কম্পিউটার প্রিন্টারটি ব্যবহার করতে পারবে। এটাকেই বলা হয় হার্ডওয়্যার(প্রিন্টার) রিসোর্স শেয়ার।
সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ারঃ একটি অফিসের পাঁচটি কম্পিউটারের জন্যই কমন যে সফটওয়্যারগুলো প্রয়োজন তা প্রতিটি কম্পিউটারে ইন্সটল করার পরিবর্তে কম্পিউটারগুলোর সমন্বয়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে সফটওয়্যারগুলো শেয়ার করা যায়। ফলে আর্থিক সাশ্রয় হয়।
ইনফরমেশন রিসোর্স শেয়ারঃ একটি অফিসের কম্পিউটারগুলোর সমন্বয়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে একে অপরের সাথে খুব সহজেই ইনফরমেশন বা তথ্য শেয়ার করা যায়।
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর প্রকারভেদ:

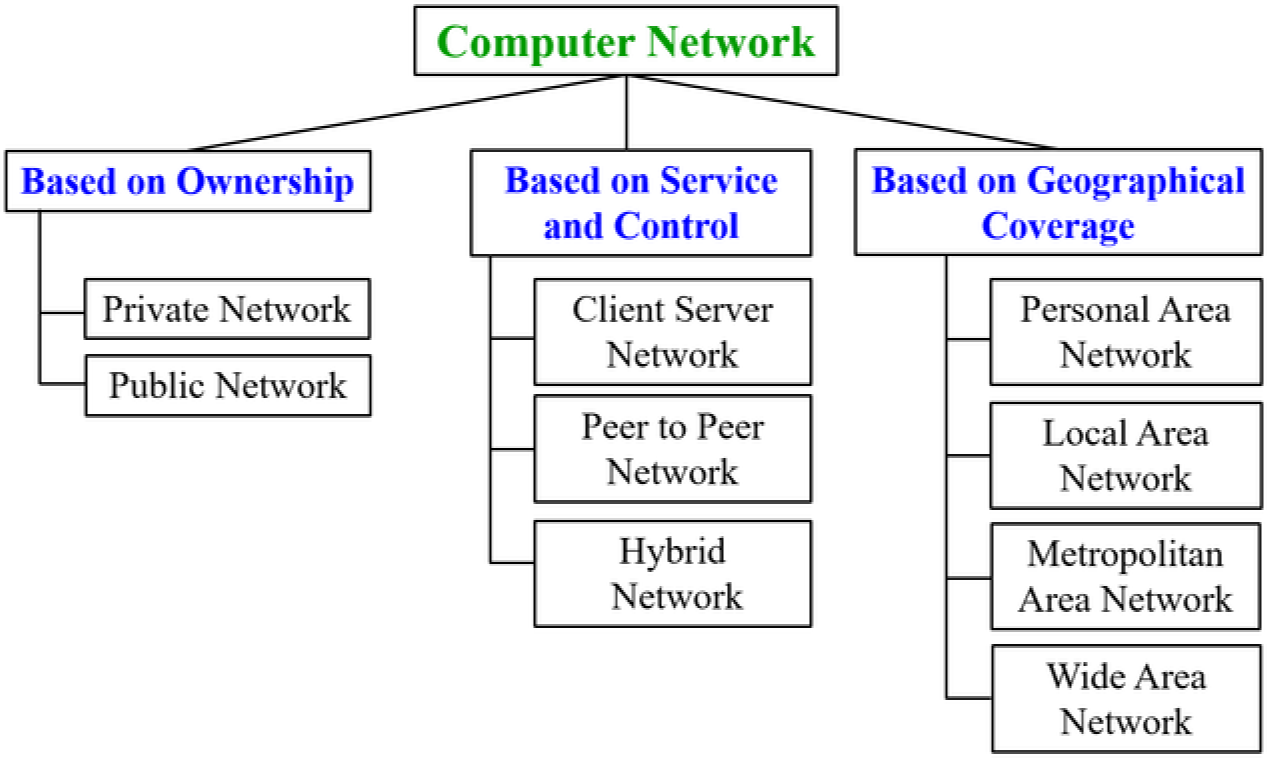

মালিকানার ভিত্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর প্রকারভেদ-

- ১। প্রাইভেট নেটওয়ার্ক
- ২। পাবলিক নেটওয়ার্ক

সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রন কাঠামোর ভিত্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর প্রকারভেদ-

- ১। পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক
- ২। ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক
- ৩। হাইব্রিড নেটওয়ার্ক

ভৌগলিক বিস্তৃতি অনুসারে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর প্রকারভেদ-

1. প্যান (PAN)-Personal Area Network
2. ল্যান (LAN)- Local Area Network
3. ম্যান (MAN)- Metropolitan Area Network
4. ওয়ান (WAN)- Wide Area Network

মালিকানার ভিত্তিতে বিভিন্ন কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আলোচনাঃ

প্রাইভেট নেটওয়ার্কঃ সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মালিকানাধীন নেটওয়ার্ককে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক বলা হয়। যেকেউ ইচ্ছা করলেই এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে না। এই ধরণের নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা অত্যন্ত মজবুত থাকে এবং ট্রাফিক সাধারণত কম থাকে। যেমন- বিভিন্ন ব্যাংকের নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা।

পাবলিক নেটওয়ার্কঃ এটি কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে যেকেউ চাইলেই অর্থের বিনিময়ে এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণস্বরুপ বিভিন্ন মোবাইল ফোন কিংবা টেলিফোন নেটওয়ার্ক সিস্টেম।

সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রন কাঠামোর ভিত্তিতে বিভিন্ন কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আলোচনাঃ

ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কঃ

ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্কে কেন্দ্রিয়ভাবে ডেটা স্টোর, নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং বিভিন্ন এপ্লিকেশন চালানো হয়। এই ধরণের নেটওয়ার্কে একটি কম্পিউটারে রিসোর্স থাকে এবং রিসোর্স শেয়ার করে যাকে সার্ভার বলা হয়, আর নেটওয়ার্কের অন্যান্য সেসব কম্পিউটার রিসোর্স ব্যবহার করে তাদেরকে ক্লায়েন্ট বলা হয়। সকল ক্লায়েন্ট একই সার্ভারে লগ-ইন করে এবং সার্ভারের সিকিউরিটি পলিসি মেনে চলে বলে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ককে সার্ভার-বেজড নেটওয়ার্কও বলা হয়।

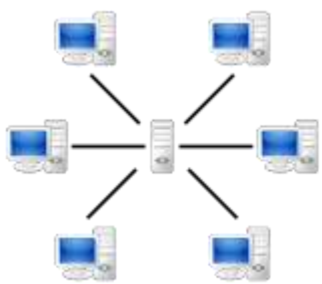

সার্ভারের সংখ্যা ও স্টোরেজ মিডিয়ার উপর নির্ভর করে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ককে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- ক) সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক
- খ) ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক

সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্কঃ সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্কে একটি কেন্দ্রিয় সার্ভার এবং কিছু টার্মিনাল বা ক্লায়েন্ট নিয়ে গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সার্ভার সকল প্রসেসিং এবং নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণের কাজ করে থাকে। আর টার্মিনাল বা ক্লায়েন্টের মাধ্যমে ব্যবহারকারী সার্ভারে যুক্ত হয়ে সার্ভিস গ্রহণ করে।

ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্কঃ ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক পরস্পর সংযুক্ত কিছু ওয়ার্কস্টেশন, বিভিন্ন শেয়ারড স্টোরেজ ডিভাইস এবং প্রয়োজনীয় ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস নিয়ে গঠিত। ওয়ার্কস্টেশনগুলোর নিজস্ব মেমোরি স্টোরেজ ও প্রসেসিং ক্ষমতা থাকায় লোকাল কাজ করতে পারে।

পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্কঃ

পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কে প্রত্যেক ব্যবহারকারী তাদের রিসোর্স অন্যের সাথে শেয়ার করতে পারে। এই ধরণের নেটওয়ার্কে কোনো ডেডিকেটেড সার্ভার থাকে না। প্রতিটি কম্পিউটার একইসাথে সার্ভার এবং ওয়ার্কস্টেশন হিসেবে কাজ করে এবং প্রতিটি মেশিন ডিসেন্ট্রালাইজ থাকে। প্রতিটি কম্পিউটার তার ডেটার নিরাপত্তা বিধানে নিজেই দায়ী থাকে।

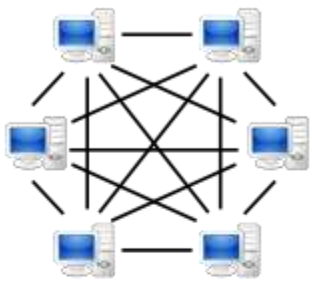

ভৌগলিক বিস্তৃতি অনুসারে বিভিন্ন কম্পিউটার নেটওয়ার্কের বিস্তারিত আলোচনাঃ

প্যান (PAN): প্যান (PAN) এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Personal Area Network। কোনো ব্যক্তির নিকটবর্তী বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তথ্য আদান-প্রদানের নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে PAN বলে। PAN ব্যক্তিগত ডিভাইসগুলোর মধ্যে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। PAN এর বিস্তৃতি সাধারণত ১০ মিটার এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। PAN এ ব্যবহৃত ডিভাইসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডিভাইস হচ্ছে ল্যাপটপ, পিডিএ, বহনযোগ্য প্রিন্টার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। PAN নেটওয়ার্কের ডিভাইসগুলোর সংযোগ তারযুক্ত বা তারবিহীন হতে পারে। যখন তারবিহীন সংযোগ দেওয়া হয়, তখন তাকে WPAN (Wireless Personal Area Network) বলা হয়। এই ধরণের নেটওয়ার্কে তার মাধ্যম হিসেবে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, USB ক্যাবল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় এবং তারবিহীন মাধ্যম হিসেবে রেডিও ওয়েব ও ইনফ্রারেড ব্যবহৃত হয়।

ল্যান (LAN): LAN এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Local Area Network। সাধারণত ১০ কি.মি. বা তার কম পরিসরের জায়গার মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার বা অন্যকোনো পেরিফেরাল ডিভাইস (যেমন- প্রিন্টার) সংযুক্ত করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় তাকে LAN বলে। এছাড়াও একটি বিল্ডিং বা পাশাপাশি অবস্থিত দুই তিনটি বিল্ডিং এর ডিভাইসগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করলে তাকেও LAN বলা হয়। এটি সাধারণত স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়, বড় কোন অফিসের কম্পিউটারগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। LAN এর টপোলজি সাধারণত স্টার, বাস, ট্রি ও রিং হয়ে থাকে। LAN নেটওয়ার্কের ডিভাইসগুলোর সংযোগ তারযুক্ত বা তারবিহীন হতে পারে। যখন তারবিহীন সংযোগ দেওয়া হয়, তখন তাকে WLAN (Wireless Local Area Network) বলা হয়। এই ধরণের নেটওয়ার্কে তার মাধ্যম হিসেবে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, কো এক্সিয়াল ক্যাবল বা ফাইবার অপটিক ক্যাবল এবং তারবিহীন মাধ্যম হিসেবে রেডিও ওয়েব ব্যবহৃত হয়।

ম্যান (MAN): MAN এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Metropolitan Area Network। একই শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কম্পিউটার এবং বিভিন্ন ডিভাইস নিয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয় তাকে MAN বলে। এটি LAN এর থেকে বড় একালা বিস্তৃতির নেটওয়ার্ক যা একটি শহরের বিভিন্ন LAN এর সংযোগেও হতে পারে। এক্ষেত্রে একাধিক LAN কে সংযুক্ত করার জন্য ফাইবার অপটিক ক্যাবল ব্যাকবোন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং নেটওয়ার্ক ডিভাইস হিসেবে রাউটার, সুইচ, হাব, ব্রিজ, গেটওয়ে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। সাধারণত কোনো ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা অফিসের মধ্যে যোগাযোগের জন্য এধরনের নেটওয়ার্ক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। MAN নেটওয়ার্কের টপোলজি ট্রি, হাইব্রিড হতে পারে। MAN নেটওয়ার্কের ডিভাইসগুলোর সংযোগ তারযুক্ত বা তারবিহীন হতে পারে। যখন তারবিহীন সংযোগ দেওয়া হয়, তখন তাকে WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) বলা হয়। এই ধরণের নেটওয়ার্কে তার মাধ্যম হিসেবে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, কো এক্সিয়াল ক্যাবল বা ফাইবার অপটিক ক্যাবল এবং তারবিহীন মাধ্যম হিসেবে রেডিও ওয়েব, মাইক্রোওয়েব ব্যবহৃত হয়।

Metropolitan Area Network (MAN)

ওয়ান (WAN): WAN এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Wide Area Network। যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অনেক বড় ভৌগোলিক বিস্তৃতি জুড়ে থাকে তাকে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে। এ নেটওয়ার্কের সাহায্যে একটি দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরের সাথে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। সাধারণত বিশ্বের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত LAN বা MAN বা অন্য কোনো কম্পিউটার ডিভাইসও এ নেটওয়ার্কে সংযুক্ত থাকতে পারে। এক্ষেত্রে একাধিক LAN বা MAN কে সংযুক্ত করার জন্য ফাইবার অপটিক ক্যাবল ব্যাকবোন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং নেটওয়ার্ক ডিভাইস হিসেবে রাউটার, সুইচ, হাব, ব্রিজ, গেটওয়ে, রিপিটার ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। LAN বা MAN নেটওয়ার্কের তার মাধ্যম হিসেবে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, কো এক্সিয়াল ক্যাবল বা ফাইবার অপটিক ক্যাবল এবং তারবিহীন মাধ্যম হিসেবে রেডিও ওয়েব, মাইক্রোওয়েব ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় WAN এর উদাহরণ হলো ইন্টারনেট।

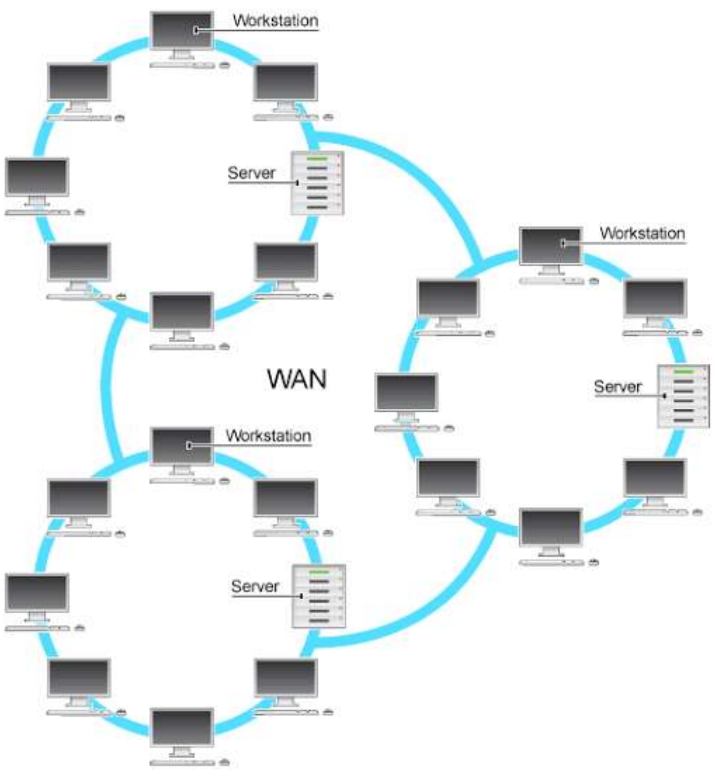

দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-৯: বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ডিভাইসসমূহ (মডেম, NIC, রিপিটার, হাব, সুইচ, রাউটার, ব্রিজ, গেটওয়ে)।

মডেম: মডেম হচ্ছে একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস যা মডুলেশন ও ডিমডুলেশনের মাধ্যমে এক কম্পিউটারের তথ্যকে অন্য কম্পিউটারে টেলিফোন লাইনের সাহায্যে পৌঁছে দেয়। মডেম শব্দটি Modulator ও Demodulator এর সংক্ষিপ্তরূপ। Modulator শব্দের ‘Mo’ এবং Demodulator শব্দের ‘Dem’ নিয়ে ‘Modem’ শব্দটি গঠিত হয়েছে। Modulator এর কাজ হচ্ছে ডিজিটাল সিগন্যালকে অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তর করা এবং Demodulator এর কাজ হচ্ছে অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করা।

উৎস কম্পিউটারের সাথে যুক্ত মডেম কম্পিউটারের ডিজিটাল সিগন্যালকে অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তর করে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বারা গ্রাহকের নিকট ডেটা বা তথ্য প্রেরণ করে। এভাবে টেলিফোন লাইনের উপযোগী করে ডিজিটাল সিগন্যালকে অ্যানালগ সিগন্যালে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে **মডুলেশন** বলে।

গন্তব্য কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত মডেম সেই অ্যানালগ সিগন্যালকে আবার ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করে তা কম্পিউটারের ব্যবহারোপযোগী করে। এভাবে টেলিফোন লাইন থেকে প্রাপ্ত অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে **ডিমডুলেশন** বলে।

এভাবে ডেটা কমিউনিকেশনে মডেম মডুলেশন এবং ডিমডুলেশনের সাহায্যে ডেটা উৎস থেকে গন্তব্যে প্রেরণ করে থাকে। এছাড়া ডেটা কমিউনিকেশনে মডেম একইসাথে প্রেরক এবং প্রাপক হিসেবে কাজ করে।

NIC: NIC এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Network Interface Card । কম্পিউটারকে নেটওয়ার্ক এর সাথে সংযুক্ত করার জন্য নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড ব্যবহার করা হয় । এ কার্ডকে ল্যান কার্ড বা নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারও বলে। এ কার্ড মাদারবোর্ডের বিভিন্ন আকৃতির স্লটের মধ্যে বসানো থাকে। অধিকাংশ NIC কার্ড কম্পিউটারের সাথে বিল্ট-ইন থাকে। নেটওয়ার্ক কার্ডে ৪৮ বিটের একটি অদ্বিতীয় কোড থাকে। এই অদ্বিতীয় কোডকে ম্যাক (MAC- Media Access Control) অ্যাড্রেস বলে। এই ম্যাক অ্যাড্রেস কার্ডের রমে সংরক্ষিত থাকে। নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড ডিভাইস এবং ডেটা কেবলের মধ্যে সিগন্যাল আদান-প্রদানের কাজটি সমন্বয় করে থাকে।

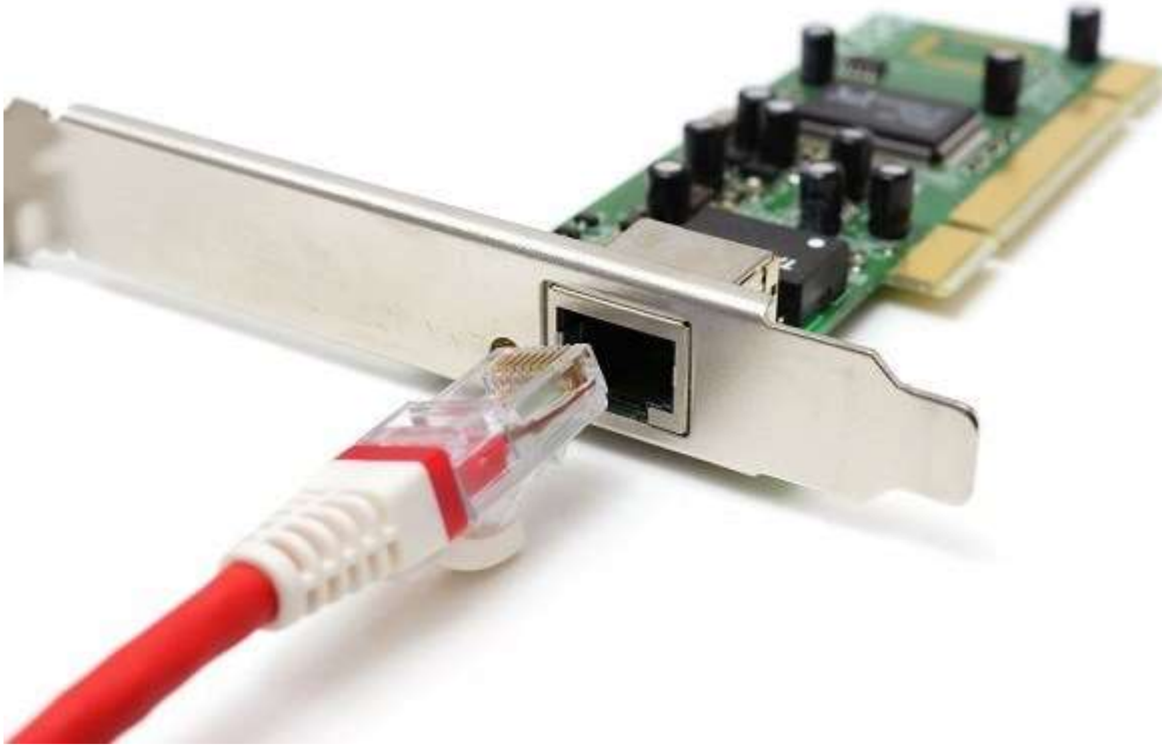

রিপিটার:
নেটওয়ার্ক মিডিয়ার মধ্য দিয়ে ডেটা সিগন্যাল প্রবাহের সময় নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার পর এটেনুয়েশনের কারণে সিগন্যাল আস্তে আস্তে দূর্বল হয়ে পড়ে। তখন এই সিগন্যালকে এমপ্লিফাই বা পুনরোদ্ধার করে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়। মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে এই কাজটি যে ডিভাইস করে থাকে তাকে রিপিটার বলে।

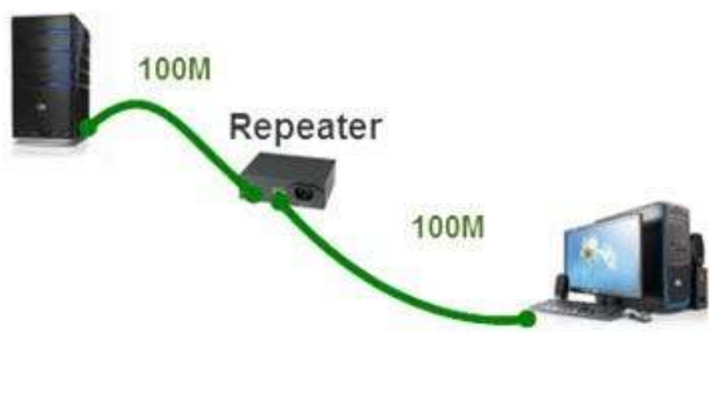

হাব: হাব একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং একে LAN ডিভাইসও বলা হয়। যার সাহায্যে নেটওয়ার্কের কম্পিউটারসমূহ পরস্পরের সাথে কেন্দ্রিয়ভাবে যুক্ত থাকে। একটি হাবে কতোগুলো ডিভাইস যুক্ত করা যাবে তা হাবের পোর্টের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। LAN তৈরি করার জন্য হাব অধিক ব্যবহৃত হয়। স্টার টপোলজির ক্ষেত্রে হাব হচ্ছে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী ডিভাইস। কোন প্রেরক হাবে ডেটা প্রেরণ করলে হাবে সংযুক্ত সকল ডিভাইস সেই ডেটা গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ হাবের ক্ষেত্রে ডেটা ব্রডকাস্ট হয়ে থাকে। ফলে নেটওয়ার্কের ট্রাফিক বৃদ্ধি পায় এবং ডেটা আদান-প্রদানে বাধা বা কলিশনের সম্ভাবনা থাকে।

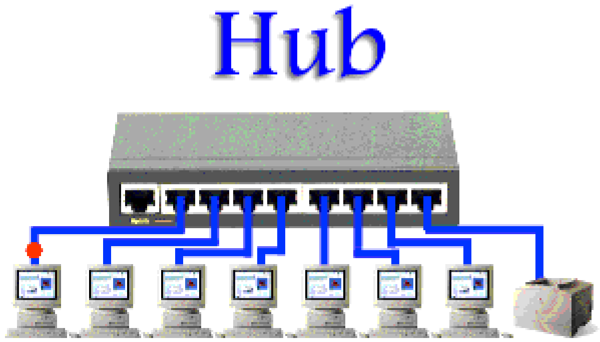

হাবের সুবিধা:

- ১। তুলনামূলকভাবে দাম কম।
- ২। বিভিন্ন মিডিয়ামকে সংযুক্ত করতে পারে।

হাবের অসুবিধা:

- ১। নেটওয়ার্কে ট্রাফিক বৃদ্ধি পায়।
- ২। ডেটা আদান-প্রদানে বাধার সম্ভাবনা থাকে।
- ৩। ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব হয় না।

সুইচ: সুইচ একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং একে LAN ডিভাইসও বলা হয়। যার সাহায্যে নেটওয়ার্কের কম্পিউটারসমূহ পরস্পরের সাথে কেন্দ্রিয়ভাবে যুক্ত থাকে। একটি সুইচে কতোগুলো ডিভাইস যুক্ত করা যাবে তা সুইচের পোর্টের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। LAN তৈরি করার জন্য সুইচ অধিক ব্যবহৃত হয়। স্টার টপোলজির ক্ষেত্রে সুইচ হচ্ছে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী ডিভাইস। হাবের সাথে সুইচের পার্থক্য হলো সুইচ প্রেরক থেকে প্রাপ্ত ডেটা সিগন্যাল নির্দিস্ট প্রাপক কম্পিউটার বা নোডে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু হাব প্রেরক থেকে প্রাপ্ত ডেটা সিগন্যাল সকল নোডে পাঠায়। ফলে সুইচ ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের ডেটা আদান-প্রদানে বাধা বা কলিশনের সম্ভাবনা থাকে না। সুইচ MAC অ্যাড্রেস নিয়ে কাজ করে।

সুইচের সুবিধা:

- ১। ডেটা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বাধার সম্ভাবনা কম।
- ২। ভার্চুয়াল LAN ব্যবহার করে ব্রডকাস্ট নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

সুইচের অসুবিধা:

- ১। হাবের তুলনায় মূল্য কিছুটা বেশি।
- ২। ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব নয়।
- ৩। কনফিগারেশন তুলনামূলকভাবে জটিল।

ব্রিজ: ব্রিজ একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস যা একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ককে ছোট ছোট সেগমেন্টে বিভক্ত করে। এর সাহায্যে ভিন্ন মাধ্যম অথবা ভিন্ন কাঠামো বিশিষ্ট একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করা যায়। এটি একাধিক ছোট নেটওয়ার্ককে

সংযুক্ত করে একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ক তৈরি করে। এটি অনেকটা সুইচ বা হাব এর মতো। এক্ষেত্রে পার্থক্য হলো, হাব বা সুইচ একই নেটওয়ার্কের বিভিন্ন নোডকে সংযুক্ত করে অন্যদিকে ব্রিজ একাধিক ছোট নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে।

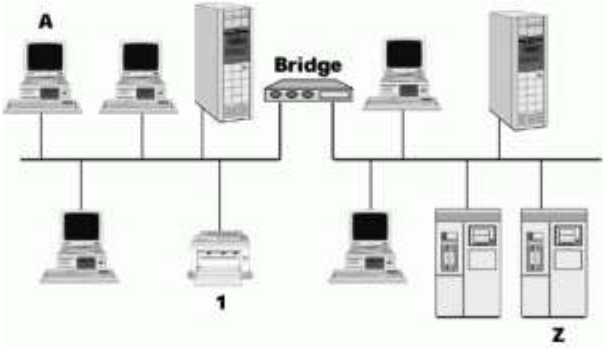

সুবিধাঃ
১। ভিন্ন মাধ্যম বিশিষ্ট অথবা ভিন্ন কাঠামো বা টপলোজি বিশিষ্ট একাধিক নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে পারে।

অসুবিধাঃ
১। ভিন্ন প্রোটকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করতে পারে না।

রাউটার:
রাউটার একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং একে WAN ডিভাইসও বলা হয়। এটি একটি বুদ্ধিমান ডিভাইস যা একই প্রটোকল বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক নেটওয়ার্ককে(LAN,MAN,WAN) সংযুক্ত করে WAN তৈরি করে।

রাউটার রাউটিং টেবিল ব্যবহার করে উৎস থেকে গন্তব্যে ডেটা স্থানান্তরের জন্য সহজ, নিরাপদ ও কম দূরত্বের পথটি বেছে নেয়। রাউটার ডেটা আদান-প্রদানের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাউটিং টেবিল তৈরি করে, যেখানে নেটওয়ার্কের সকল নোডের অ্যাড্রেস এবং পাথ থাকে। রাউটিং টেবিলটি রাউটারের মেমোরিতে সংরক্ষিত থাকে। এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে ডেটা পাঠানোর পদ্ধতিকে রাউটিং বলে। এটি একাধিক LAN, MAN এবং WAN কে যুক্ত করে WAN গঠন করতে পারে।

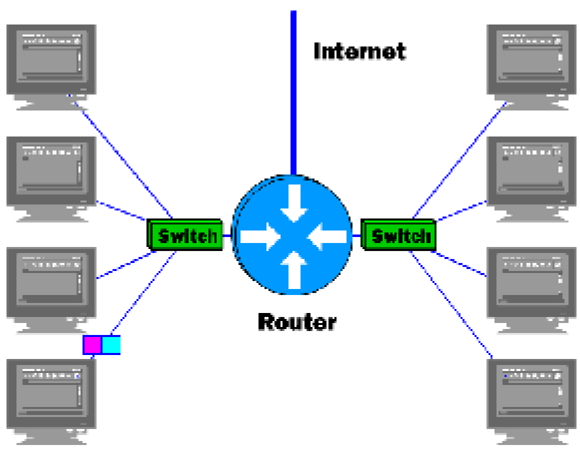

রাউটারের সুবিধাসমূহ:
- ১। ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে বাধার সম্ভাবনা কমায়।
- ২। ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব হয়।
- ৩। বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক যেমন-ইথারনেট, টোকেন, রিং ইত্যাদিকে সংযুক্ত করতে পারে।

রাউটারের অসুবিধা:

- ১। রাউটারের দাম বেশি।
- ২। রাউটার ভিন্ন প্রোটোকলের নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করতে পারে না।
- ৩। কনফিগারেশন তুলনামূলক জটিল।

গেটওয়ে: গেটওয়ে একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং একে WAN ডিভাইসও বলা হয়। এটি ভিন্ন প্রটোকল বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক নেটওয়ার্ককে(LAN,MAN,WAN) সংযুক্ত করে WAN তৈরি করে। ভিন্ন প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করার সময় গেটওয়ে প্রটোকল ট্রান্সলেশন করে থাকে। বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ডিভাইস যেমন – হাব, সুইচ এবং রাউটার ইত্যাদি ডিভাইসসমূহ প্রোটোকল ট্রান্সলেশনের সুবিধা দেয় না।

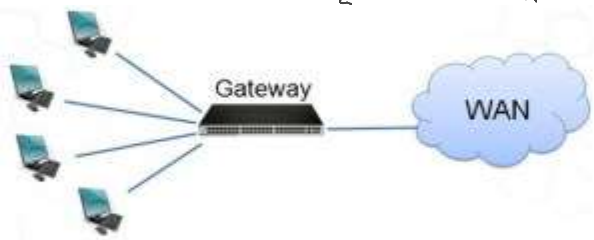

গেটওয়ের সুবিধাসমূহ:
- ১। ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে বাধার সম্ভাবনা কম।
- ২। ভিন্ন প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে পারে।

গেটওয়ের অসুবিধাসমূহ:
- ১। এটি ধীর গতিসম্পন্ন।
- ২। অন্যান্য ডিভাইসের চেয়ে ব্যয়বহুল।
- ৩। কনফিগারেশন করা তুলনামূলক জটিল।

একটি নেটওয়ার্কে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ডিভাইস এর ব্যবহারঃ

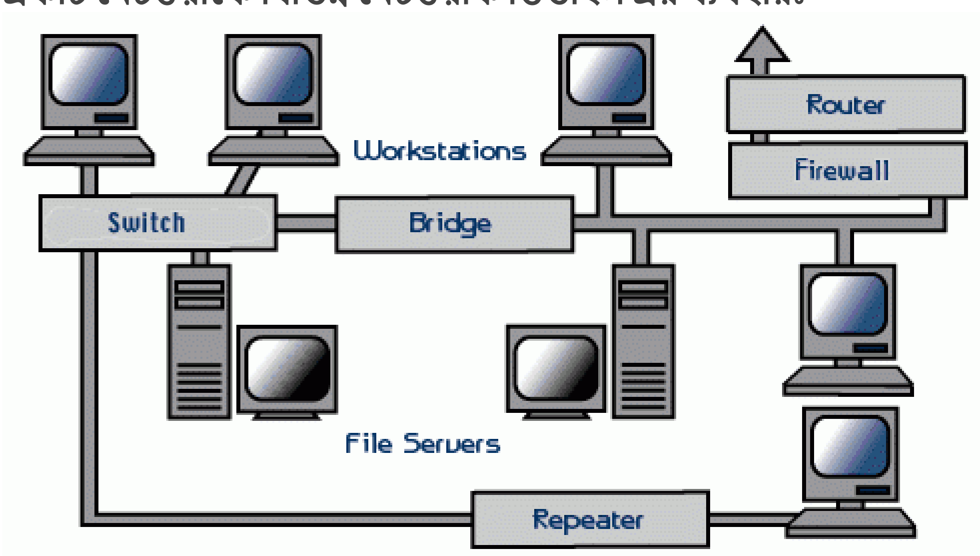

দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-১০: নেটওয়ার্ক টপোলজি (বাস, স্টার, রিং, ট্রি, মেশ এবং হাইব্রিড)।

নেটওয়ার্ক টপোলজিঃ কম্পিউটার নেটওয়ার্কে কম্পিউটারসমূহ একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে। এই সংযোগ বিভিন্ন ভাবে দেওয়া যায়।
নেটওয়ার্কে কম্পিউটারসমূহ যে জ্যামিতিক সন্নিবেশে সংযোগ করা হয় সেই জ্যামিতিক সন্নিবেশকে নেটওয়ার্ক টপোলজি বলে।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কে নিম্ন বর্ণিত ছয় ধরণের টপোলজি থাকে। যথা –

- ১। বাস নেটওয়ার্ক টপোলজি (Bus Network Topology)
- ২। স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজি (Star Network Topology)
- ৩। রিং নেটওয়ার্ক টপোলজি (Ring Network Topology)
- ৪। ট্রি নেটওয়ার্ক টপোলজি (Tree Network Topology)
- ৫। মেশ নেটওয়ার্ক টপোলজি (Mesh Network Topology)
- ৬। হাইব্রিড নেটওয়ার্ক টপোলজি (Hybrid Network Topology)

বাস নেটওয়ার্ক টপোলজি (Bus Network Topology): বাস টপোলজিতে একটি মূল তার বা ক্যাবলের সাথে সকল কম্পিউটার বা নোড (একটি নেটওয়ার্কে সংযুক্ত প্রতিটি ডিভাইসকে একটি নোড বলা হয়।) সংযুক্ত থাকে। বাস টপোলজির এই প্রধান ক্যাবলটিকে বলা হয় ব্যাকবোন। সংযোগ লাইনকে সাধারণত বাস বলা হয়। ডেটা প্রেরণের জন্য প্রেরক নোড ডেটা সিগন্যাল মূল তার বা ক্যাবলে পাঠায় ফলে মূল ক্যাবলে সংযুক্ত সকল নোড সেই ডেটা পায়। সকল নোড প্রাপ্ত ডেটা সিগন্যাল পরীক্ষা করে এবং কেবলমাত্র প্রাপক নোড সেই ডেটা সিগন্যাল গ্রহণ করে।

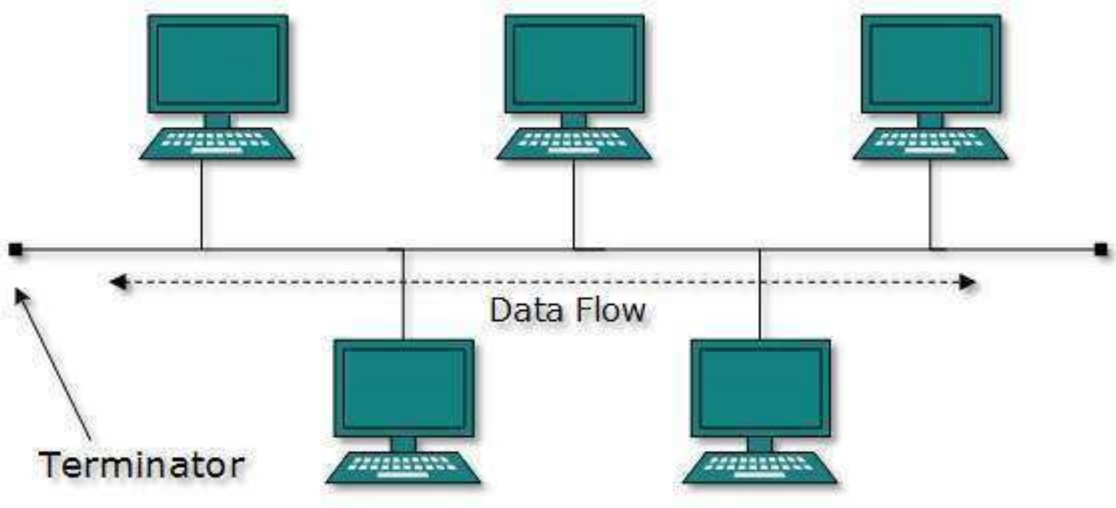

বাস টপোলজি ব্যবহারের সুবিধাসমূহ:
- ১। এ টপোলজির প্রধান সুবিধা হলো নেটওয়ার্ক খুব সাধারণ এবং ফিজিক্যাল লাইনের সংখ্যা মাত্র একটি।
- ২। রিপিটারের সাহায্যে নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন বা বাস সহজে সম্প্রসারণ করা যায়।
- ৩। এ টপোলজি সহজ সরল এবং ছোট আকারের নেটওয়ার্কে ব্যবহার করা সহজ।
- ৪। বাস টপোলজির কোনো একটি কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলেও অন্য কম্পিউটারে কাজ করতে কোনো অসুবিধা হয় না
- ৫। সহজেই কোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব।
- ৬। বাস টপোলজিতে কম্পিউটার সংযুক্ত করতে কম তারের প্রয়োজন হয় ফলে খরচ কম হয়।

বাস টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধাসমূহঃ

- ১। মূল ক্যাবল বা ব্যাকবোন নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক সিস্টেম অচল হয়ে যায়।
- ২। এই টপোলজিতে ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য কোনো সমন্বয়ের ব্যবস্থা নেই। যেকোনো কম্পিউটার বা নোড যেকোনো সময়ে ডেটা ট্রান্সমিশন করতে পারে। ফলে ট্রাফিক সৃষ্টি হয় এবং ডেটা কলিশনের ঘটনা ঘটে।
- ৩। নেটওয়ার্কে কম্পিউটার সংখ্যা বেশি হলে ডেটা ট্রান্সমিশন বিঘ্নিত হয়।
- ৪। বাস টপোলজিতে সৃষ্ট সমস্যা নির্ণয় তুলনামূলক বেশ জটিল।
- ৫। ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি কম।

স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজি (Star Network Topology): স্টার টপোলজিতে সবগুলো কম্পিউটার বা নোড একটি কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক ডিভাইসের (সুইচ , হাব) সাথে সংযুক্ত থাকে। নোডগুলো হাব (hub) বা সুইচ (switch) এর মাধ্যমে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে ও ডেটা আদান -প্রদান করে। কোনো প্রেরক নোড ডেটা প্রেরণ করতে চাইলে তা প্রথমে হাব অথবা সুইচে পাঠিয়ে দেয়। এরপর হাব বা সুইচ সেই সিগন্যালকে প্রাপক নোডে পাঠিয়ে দেয়।

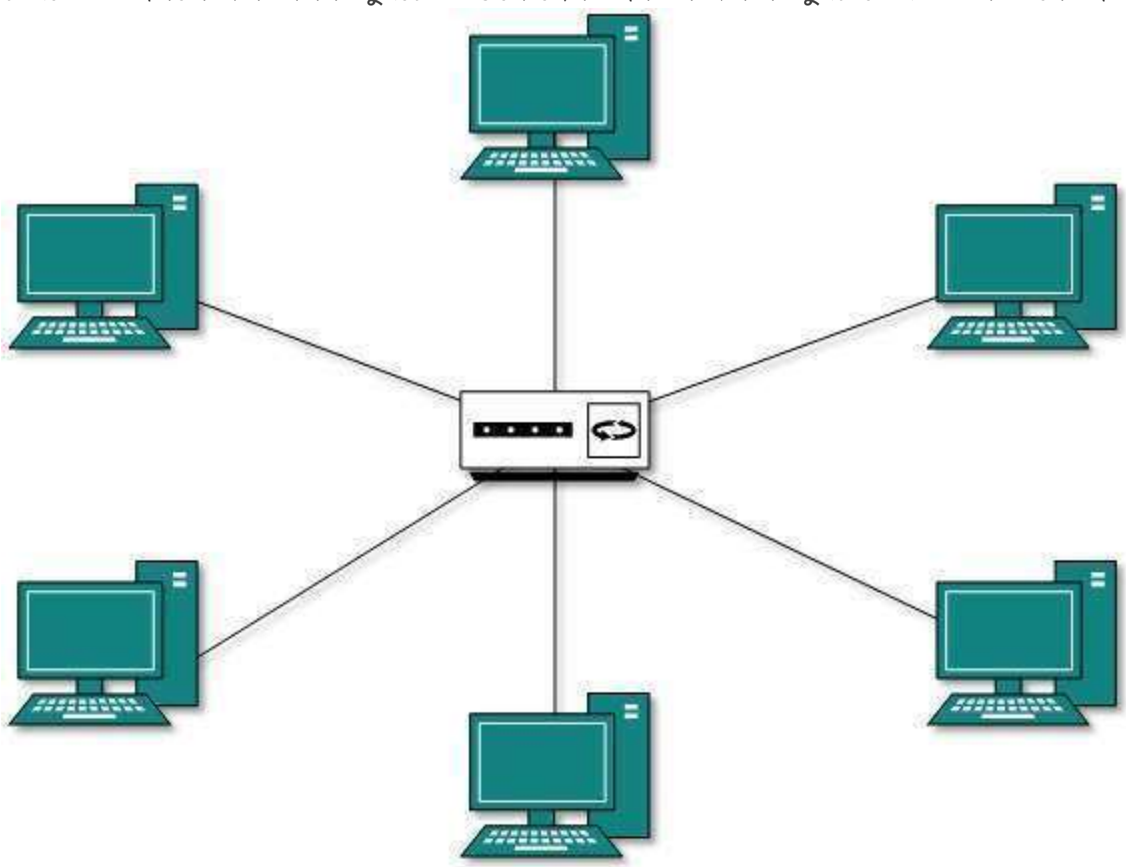

স্টার টপোলজির সুবিধাসমূহ:

- ১। এই টপোলজিতে কোনো কম্পিউটার বা নোড নষ্ট হলেও নেটওয়ার্কের বাকি নোডের কাজের ব্যাঘাত হয় না।
- ২। এই টপোলজিতে নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করা যায়।
- ৩। যেকোন সময় কোনো কম্পিউটার বা নোড যোগ করা বা বাদ দেওয়া যায়, তাতে কাজে কোনো বিগ্ন ঘটে না।
- ৪। কেন্দ্রীয়ভাবে নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ বা সমস্যা নিরূপণ করা সহজ।
- ৫। ডেটা চলাচলের গতি বেশি।

স্টার টপোলজির অসুবিধাসমূহ:

- ১।এই টপোলজিতে কেন্দ্রীয় ডিভাইসটি(হাব বা সুইচ) নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক সিস্টেমই অচল হয়ে যায়।
- ২। স্টার টপোলজিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যাবল এবং কেন্দ্রীয় ডিভাইস ব্যবহৃত হয় বিধায় এটি ব্যয়বহুল।

রিং নেটওয়ার্ক টপোলজি (Ring Network Topology): রিং টপোলজিতে প্রতিটি কম্পিউটার বা নোড ক্যাবলের সাহায্যে তার পার্শ্ববর্তী দুটি কম্পিউটারের সাথে সরাসরি সংযুক্ত হয়ে একটি লুপ বা রিং গঠন করে। এভাবে রিংয়ের সর্বশেষ কম্পিউটার প্রথমটির সাথে যুক্ত হয়। এই টপোলজিতে সিগন্যাল একটি নির্দিষ্ট দিকে ট্রান্সমিশন হয়। এক্ষেত্রে টপোলজির প্রতিটি ডিভাইসে একটি রিসিভার এবং একটি ট্রান্সমিটার থাকে যা রিপিটারের কাজ করে। এক্ষেত্রে রিপিটারের দায়িত্ব হচ্ছে সিগন্যাল একটি কম্পিউটার থেকে তার পরের কম্পিউটারে পৌছেঁ দেওয়া। নেটওয়ার্কের কোনো একটি কম্পিউটার সংকেত পুনঃপ্রেরণের ক্ষমতা হারালে কিংবা কম্পিউটারটি নষ্ট হয়ে গেলে পুরো নেটওয়ার্কটি অকেজো হয়ে যায়। এক্ষেত্রে নষ্ট কম্পিউটারটি অপসারণ করে পুনরায় সংযোগ সম্পন্ন করতে হয়।

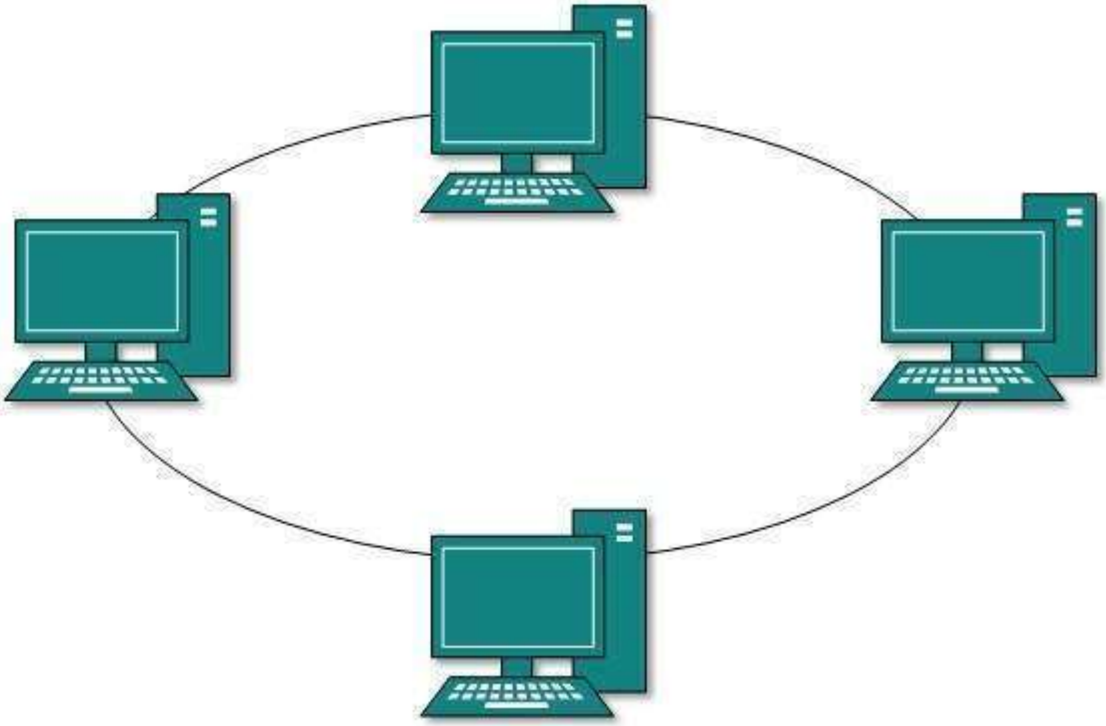

রিং টপোলজি ব্যবহারের সুবিধাসমূহ:

- ১। নেটওয়ার্কে কোনো সার্ভার কম্পিউটারের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ এটি এক ধরনের ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটা প্রসেসিং সিস্টেম।
- ২। নেটওয়ার্কে কম্পিউটার সংখ্যা বাড়লেও এর দক্ষতা খুব বেশি প্রভাবিত হয় না।
- ৩। নেটওয়ার্কে কোনো নোডকে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় কোনো কম্পিউটারের উপর নির্ভর করতে হয় না।

রিং টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ:

- ১। নেটওয়ার্কের একটি মাত্র কম্পিউটার নষ্ট হলে পুরো নেটওয়ার্ক অচল হয়ে যায়।
- ২। রিং টপোলজির ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের কোনো সমস্যা নিরুপণ বেশ জটিল।
- ৩। নেটওয়ার্কে কোনো কম্পিউটার যোগ করলে বা সরিয়ে নিলে তা পুরো নেটওয়ার্কের কার্যক্রম ব্যাহত করে।
- ৪। নেটওয়ার্কে কম্পিউটারের সংখ্যা বাড়লে ডেটা ট্রান্সমিশনের সময়ও বেড়ে যায়।
- ৫। রিং টপোলজির জন্য জটিল নিয়ন্ত্রণ সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়।

ট্রি নেটওয়ার্ক টপোলজি (Tree Network Topology): এটি মুলত বাস বা স্টার টপোলজির সম্প্রসারিত রুপ।এই টপোলজিতে একাধিক হাব বা সুইচ ব্যবহার করে সমস্ত কম্পিউটারগুলো একটি বিশেষ স্থানে সংযুক্ত করা হয় যাকে বলে রুট । রুট হিসেবে অনেক সময় সার্ভারও থাকেতে পারে। যে টপোলজিতে কম্পিউটারগুলো পরস্পরের সাথে গাছের শাখা-প্রশাখার মতো বা বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত থাকে তাকে ট্রি টপোলজি বলা হয়। এই টপোলজিতে প্রথম স্তরের কম্পিউটারগুলো দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটারগুলোর হোস্ট হয়। একইভাবে দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটারগুলো তৃতীয় স্তরের কম্পিউটারগুলোর হোস্ট হয়।

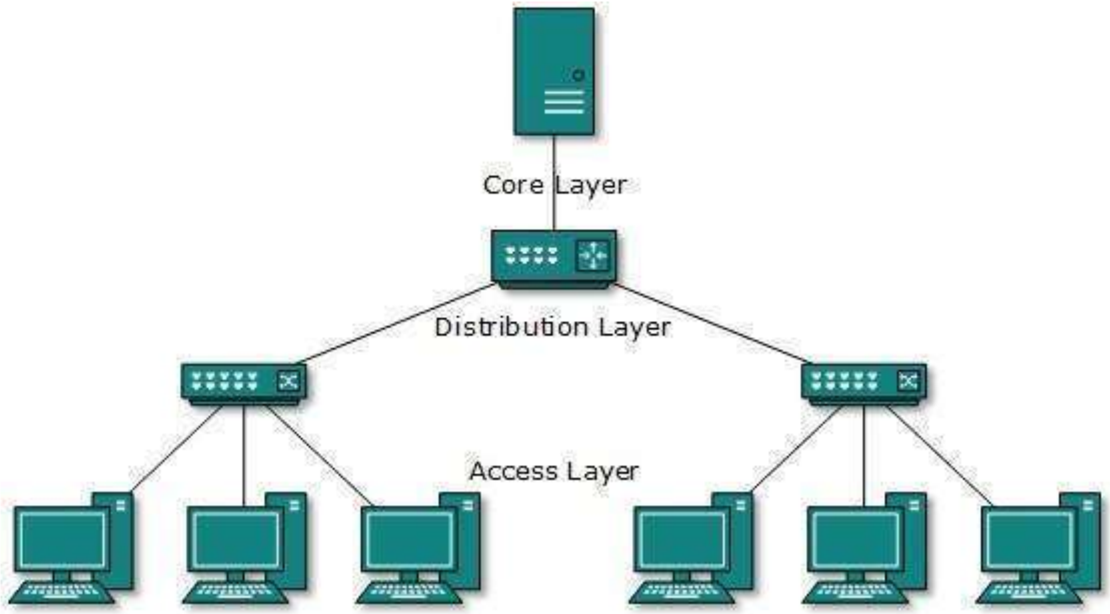

ট্রি-টপোলজি ব্যবহারের সুবিধা:

- ১। অফিস ব্যবস্থাপনার কাজে এ নেটওয়ার্ক টপোলজি খুবই উপযোগী।
- ২। শাখা-প্রশাখা সৃষ্টির মাধ্যমে ট্রি-টপোলজির নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা সহজ।
- ৩। নতুন কোনো নোড সংযোগ বা বাদ দিলে নেটওয়ার্কের স্বাভাবিক কাজকর্মের কোনো অসুবিধা হয় না।

ট্রি-টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধা:

- ১। এই টপোলজি কিছুটা জটিল ধরনের।
- ২। রুট বা সার্ভার কম্পিউটারে ত্রুটি দেখা দিলে নেটওয়ার্কটি অচল হয়ে যায়।

মেশ নেটওয়ার্ক টপোলজি (Mesh Network Topology): মেস টপোলজির ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের অধীনস্থ প্রত্যেক কম্পিউটার অপর প্রত্যেক কম্পিউটারের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে। যদি কোনো সময় একটি সংযোগ লাইন নষ্ট হয় তবে বিকল্প সংযোগ লাইন থাকে যোগাযোগের জন্য।

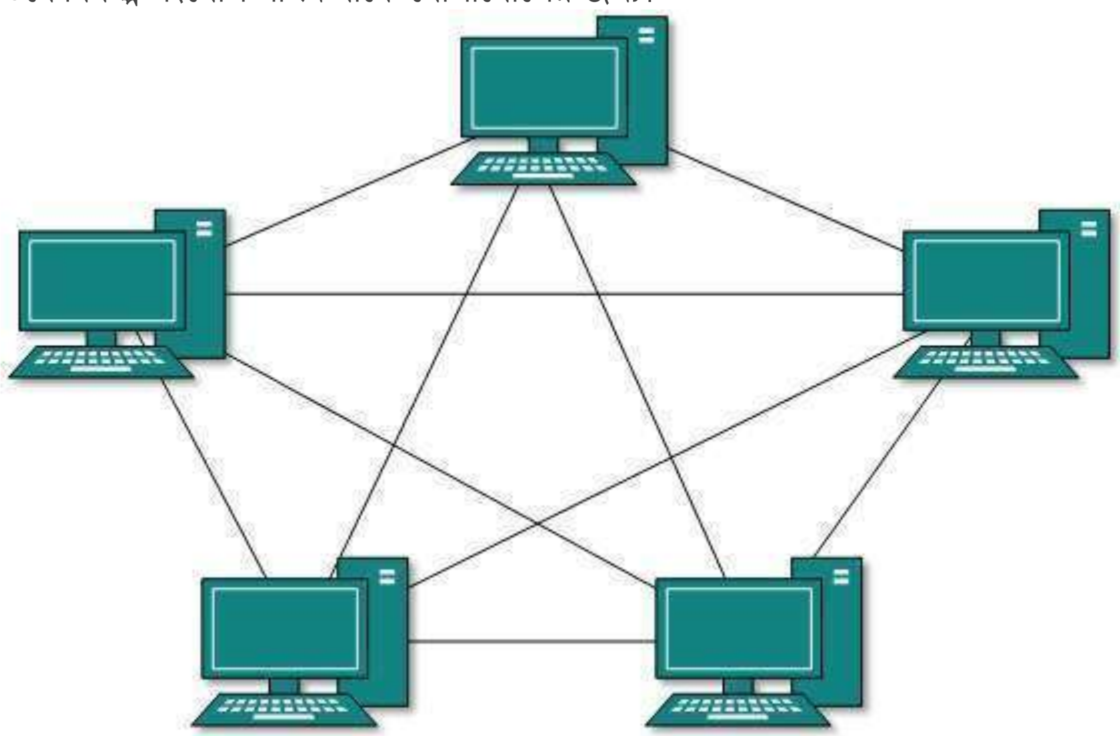

মেস টপোলজি ব্যবহারের সুবিধাসমূহ:

- ১। যেকোনো দুটি নোডের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ডেটা আদান-প্রদান করা যায়।
- ২। একটি সংযোগ লাইন নষ্ট হয়ে গেলেও বিকল্প সংযোগ লাইন ব্যবহার করে ডেটা আদান-প্রদান করা যায়।
- ৩। এতে ডেটা কমিউনিকেশনে অনেক বেশি নিশ্চয়তা থাকে।
- ৪। নেটওয়ার্কের সমস্যা খুব সহজে সমাধান করা যায়।

মেস টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ:

- ১। এই টপোলজিতে নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশন বেশ জটিল।
- ২। নেটওয়ার্কে অতিরিক্ত লিংক স্থাপন করতে হয় বিধায় এতে খরচ বেড়ে যায়।

হাইব্রিড নেটওয়ার্ক টপোলজি (Hybrid Network Topology): ভিন্ন টপোলজির একাধিক টপোলজি নিয়ে গড়ে ওঠে হাইব্রিড টপোলজি। উদাহরণস্বরূপ- ইন্টারনেটকে হাইব্রিড টপোলজি হিসেবে অভিহিত করা যায়। ইন্টারনেট একটি হাইব্রিড নেটওয়ার্ক, কেননা ইন্টারনেট হলো বৃহৎ পরিসরের একটি নেটওয়ার্ক যেখানে সব ধরনের টপোলজির মিশ্রণ দেখা যায়।

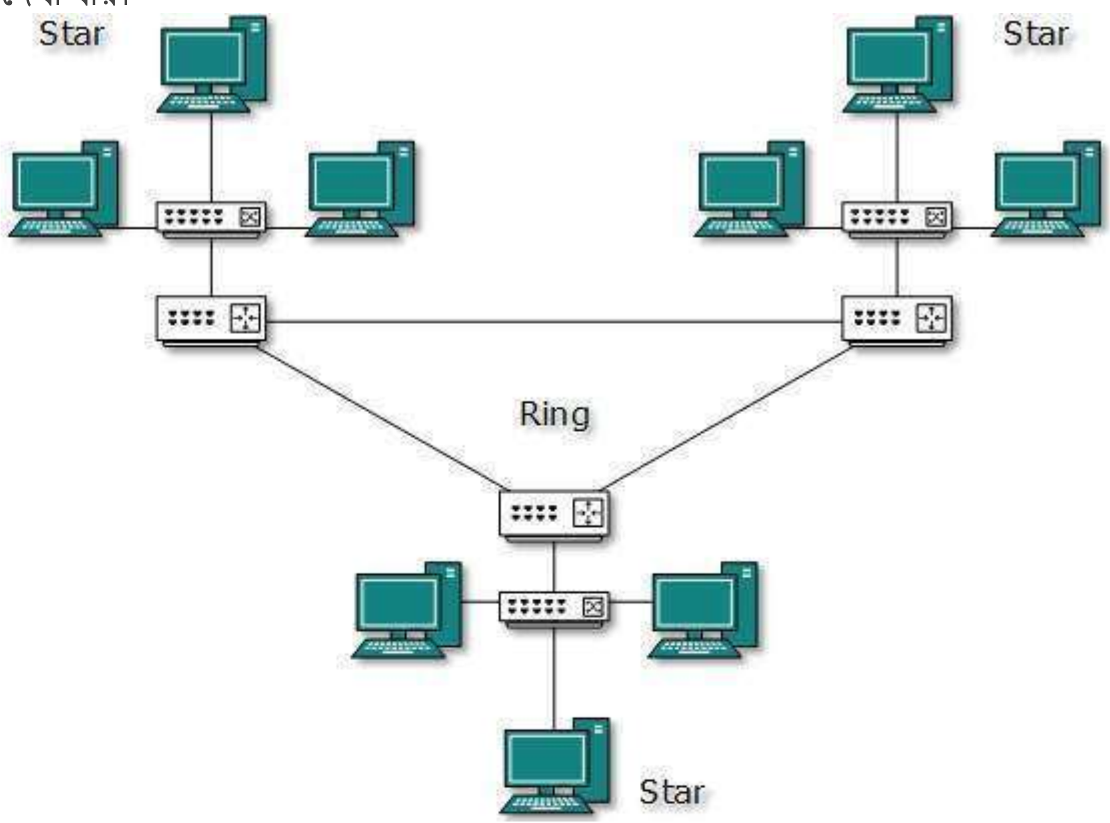

হাইব্রিড টপোলজি ব্যবহারের সুবিধা:

- ১। এই টপোলজিতে প্রয়োজন অনুযায়ী নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে।
- ২। কোনো একটি অংশ নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক অচল হয় না।

হাইব্রিড টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধা:

- ১। এই টপোলজিতে ব্যবহৃত হাবসমূহ সর্বদা সচল রাখতে হয়।
- ২। নেটওয়ার্ক স্থাপন জটিল ও ব্যয়সাধ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-১১: ক্লাউড কম্পিউটিং।

ক্লাউড কম্পিউটিং:ক্লাউড কম্পিউটিং হলো ইন্টারনেট ভিত্তিক একটি বিশেষ পরিসেবা বা একটা ব্যবসায়িক মডেল, যেখানে বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স শেয়ার, কম্পিউটিং সেবা, সার্ভার, স্টোরেজ, সফটওয়্যার প্রভৃতি সেবা সহজে ক্রেতার সুবিধা মতো, চাহিবামাত্র ও চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান করা বা ভাড়া দেওয়া হয়।
এটি কোনো নির্দিষ্ট টেকনোলজি নয়, বেশ কয়েকটি টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা একটা ব্যবসায়িক মডেল বা বিশেষ পরিসেবা। যাতে নিম্নোক্ত ৩ টি বৈশিষ্ট্য থাকবে।

- ১। রিসোর্স স্কেলেবিলিটি
- ২। অন-ডিমান্ড
- ৩। পে-অ্যাজ-ইউ-গো

রিসোর্স স্কেলেবিলিটি: ছোট বা বড় যেকোন ক্রেতার সকল ধরণের চাহিদাই মেটাতে হবে।
অন-ডিমান্ড: ক্রেতা যখন চাইবে, তখনই সেবা দিতে হবে। ক্রেতা তার ইচ্ছা অনুযায়ী যখন খুশি তার চাহিদা বাড়াতে বা কমাতে পারবে।
পে-অ্যাজ-ইউ-গো: এটি একটি পেমেন্ট মডেল। ক্রেতাকে পূর্বে থেকে কোনো পেমেন্ট করতে হবে না। ক্রেতা যতটুকু রিসোর্স যত সময়ের জন্য ব্যবহার করবে কেবলমাত্র তার জন্যই পেমেন্ট দিতে হবে।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর বৈশিষ্ট্য:

- ১। বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স (হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ইত্যাদি) শেয়ার করে কোন ব্যক্তি বা কোম্পানির খরচ কমানো যায়।
- ২। অধিক নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ সিস্টেম।
- ৩। এটি যেকোন জায়গা থেকে যেকোন সময় সহজে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করা যায়।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর সেবাসমূহঃ

- ১। অবকাঠামোগত সেবা (Infrastructure as a Service-IaaS)
- ২। প্লাটফর্মভিত্তিক সেবা (Platform as a Service-PaaS)
- ৩। সফটওয়্যার সেবা (Software as a Service-SaaS)
- ৪। নেটওয়ার্ক সেবা (Network as a Service- NaaS

অবকাঠামোগত সেবা (IaaS: Infrastructure-as-a-Service): এই ধরণের সেবায় অবকাঠামো বা Infrastructure ভাড়া দেয়া হয়। অর্থাৎ এই ধরণের সেবায় সার্ভারে বিভিন্ন ভার্চুয়াল মেশিন চালানো হয়। ক্লায়েন্ট সেই মেশিন ভাড়া নেয় এবং সেই মেশিনে ক্লায়েন্ট নিজের ইচ্ছামতো সফটওয়্যার ইন্সটল করতে পারে। এটি একটি সম্পূর্ণ কম্পিউটার এর মতই কাজ করে এবং সিস্টেমের পুরো নিয়ন্ত্রণ ইউজারের হাতে থাকে। অর্থাৎ ইউজার নিজের মত করে সেই মেশিনে দরকারী কাজ করতে পারে।
আমাজন ইলাস্টিক কম্পিউটিং ক্লাউড (EC2) এর উদাহরণ। (EC2)-তে ডেটা সেন্টারের প্রতি সার্ভারে ১ থেকে ৮টি ভার্চুয়াল মেশিন চলে, ক্লায়েন্টরা এইগুলো ভাড়া নেয়। ভার্চুয়াল মেশিনে নিজের ইচ্ছামতো উইন্ডোজ বা লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম বসানো যায়।

প্লাটফর্মভিত্তিক সেবা (Platform as a Service-PaaS): এখানে সরাসরি ভার্চুয়াল মেশিন ভাড়া না দিয়ে ভাড়া দেয়া হয় প্ল্যাটফর্ম, যার উপরে ব্যবহারকারী অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারে। ক্লাউড প্রোভাইডার এখানে ভার্চুয়াল মেশিনগুলোর উপরে আরেকটা লেয়ার যোগ করতে পারে। ব্যবহারকারী Application Programming Interface-API ব্যবহার করে এই প্ল্যাটফর্ম লেয়ারের নানা সার্ভিস কনফিগার ও ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে একটা সমস্যা হল, উক্ত সিস্টেম, ডেটাবেজ কিংবা এপ্লিকেশান এর নিয়ন্ত্রণ ইউজারের থাকবে না যেটা শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকচার এ ছিল। গুগলের অ্যাপ ইঞ্জিন এর একটা উদাহরণ।
সফটওয়্যার সেবা (Software as a Service-SaaS): এই ব্যবস্থায় ক্লাউড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করা অ্যাপলিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহারকারী ইন্টারনেটের মাধ্যমে চালাতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে Google Docs এর

কথাই ধরা যাক। ইন্টারনেট ও ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে Google Docs দিয়ে মাইক্রোসফট অফিসের প্রায় সব কাজই করা যায় (যেমন- ডকুমেন্ট, স্প্রেডশীট, প্রেজেন্টেশন)। গুগল এই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারটি আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। সফটওয়্যারটি চলছে গুগলের ক্লাউডের উপরে।

নেটওয়ার্ক সেবা(Network as a Service-SaaS): এই সেবাটি নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীকে আন্তঃক্লাউড নেটওয়ার্ক বা ট্রান্সপোর্ট কানেকটিভিটি সুবিধা প্রদান করে। এটি ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক ও কম্পিউটার রিসোর্স অনুযায়ী ব্যবহারকারীকে রিসোর্স ব্যবহারের সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করে। এই সার্ভিসের বিভিন্ন মডেলের মধ্যে VPN (Virtual Private Network), BoD (Bandwidth on Demand), Mobile Network Virtualization উল্লেখযোগ্য।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর প্রকারভেদঃ

- ১। পাবলিক ক্লাউড
- ২। প্রাইভেট ক্লাউড
- ৩। কমিউনিটি ক্লাউড
- ৪। হাইব্রিড ক্লাউড

পাবলিক ক্লাউড: পাবলিক ক্লাউড হলো এমন ক্লাউড, যেখানে পাবলিক অ্যাপলিকেশন,স্টোরেজ ও অন্যান্য রিসোর্সসমুহ সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে। অর্থাৎ যে টাকা দিবে, সেই সার্ভিস পাবে, এমন ক্লাউডকে বলা হয় পাবলিক ক্লাউড। যেমন- আমাজনের EC2। এসব ক্লাউডে সুবিধা হলো যে কেউ এর সেবা নিতে পারে। আর অসুবিধাটা হলো একই জায়গায় একাধিক ক্লায়েন্ট ব্যবহারের ফলে নিরাপত্তার সমস্যা হতে পারে।

প্রাইভেট ক্লাউড: যখন কোনো বড় সংস্থার নিজের নানা সার্ভিস চালানোর জন্য ক্লাউড সিস্টেম ডেভেলোপ করে তখন তাকে প্রাইভেট ক্লাউড বলে। এটি সাধারনত অভ্যন্তরীণভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা হয়। এতে খরচ অনেক বেশি হয়, নিজস্ব ডেটা সেন্টার বসাতে হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজস্ব জনবল রাখার প্রয়োজন হয়। তবে বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এর সুবিধা হচ্ছে, কোনো বড় কোম্পানিতে ১০টা ডিপার্টমেন্ট থাকলে ১০টা ডেটা সেন্টার না বসিয়ে একটাকেই ক্লাউড মডেলে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা যায়।

কমিউনিটি ক্লাউড: সাধারণত কোনো বিশেষ কমিউনিটির জন্য যে ক্লাউড ব্যবস্থা করা হয় সেটি হলো কমিউনিটি ক্লাউড। ধরা যাক, ঢাকা সেনানিবাসে শুধু অফিসার ও সৈনিকদের জন্য একটা ক্লাউড বসানো হলো, তাহলে কেবল অফিসার ও সৈনিকরাই এর সার্ভিস নিতে পারবে। কমিউনিটি ক্লাউডের সুবিধা হলো, কমিউনিটির মধ্যে ইউজার সীমাবদ্ধ থাকে বলে এখানে সিকিউরিটির কোনো সমস্যা নেই। আর অসুবিধা হলো এখানে ক্লায়েন্টের সংখ্যা সীমিত বলে খরচ বেশি হয়।

হাইব্রিড ক্লাউড: দুই বা ততোধিক ক্লাউডের সমন্বয়ে গঠিত ক্লাউডকে হাইব্রিড ক্লাউড বলে। এক্ষেত্রে হাইব্রিড ক্লাউড হলো পাবলিক আর প্রাইভেটের সংমিশ্রণ অথবা একাধিক ভিন্ন ক্লাউডের সংমিশ্রণ। এর ফলে অধিক পরিমান রিসোর্স শেয়ার করা যায়।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধা সমুহ:

- ১। যেকোনো স্থান থেকে যেকোন সময় ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লাউড সেবা গ্রহণ করা যায়।
- ২। নিজস্ব হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয় না ফলে খরচ কম।
- ৩। কোম্পানির অপারেটিং খরচ তুলনামুলক কম থাকে।
- ৪। ক্লাউডে সংরক্ষিত তথ্য যেকোনো স্থান থেকে যেকোন সময় এক্সেস করা যায় এবং তথ্য কীভাবে প্রসেস বা সংরক্ষিত হয় তা জানার প্রয়োজন হয় না।
- ৫। সহজে কাজকর্ম মনিটরিং এর কাজ করা যায় ফলে বাজেট ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কর্মকান্ড পরিচালনা করা যায়।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর অসুবিধা সমুহ:

- ১। ডেটা, তথ্য অথবা প্রোগ্রাম বা অ্যাপলিকেশন এর উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না।
- ২। এটি দ্রুতগতি সম্পন্ন নয়।
- ৩। আবহাওয়াজনিত কারণে বা ইন্টারনেট সংযোগ বিঘ্নিত হলে সার্ভিস বিঘ্নিত হয়।
- ৪। ক্লাউড সাইটটিতে সমস্যা দেখা দিলে ব্যবহারকারীরা তার সার্ভিস থেকে বঞ্চিত হন।
- ৫। তথ্যের গোপনীয়তা ভঙ্গের এবং তথ্য পাল্টে যাওয়ার অর্থাৎ হ্যাকিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

- ৬। তথ্য ক্লাউডে পাঠিয়ে দেওয়ার পর তা কোথায় সংরক্ষণ হচ্ছে বা কিভাবে প্রসেস হচ্ছে তা ব্যবহারকারীদের জানার উপায় থাকে না।

দ্বিতীয় অধ্যায় – জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ।

ডেটা কমিউনিকেশন কী?
কমিউনিকেশন শব্দটি Communicare শব্দ হতে এসেছে যার অর্থ to share(আদান-প্রদান/ বিনিময়)। সুতরাং এক ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক যন্ত্র থেকে অন্য যন্ত্রে নির্ভরযোগ্যভাবে তথ্যের আদান-প্রদান বা বিনিময়ই হচ্ছে ডেটা কমিউনিকেশন।

ব্যান্ডউইথকী?
প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমান ডেটা ট্রান্সফার হয় অর্থাৎ ডেটা ট্রান্সফারের হারকে ব্যান্ডউইথ বলে। একে ট্রান্সমিশন স্পিডও বলা হয়। এই ব্যান্ডউইথ সাধারণত Bit per Second (bps) এ হিসাব করা হয়। বাইনারী ডিজিট ০ এবং ১ কে বিট বলে। একে b দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড কী?
ডেটা ট্রান্সমিশন বলতে ডেটা পরিবহন বা ডেটা স্থানান্তর বুঝায়। ডেটা ট্রান্সমিশন হওয়ার জন্য উৎস ও গন্তব্যের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকতে হয় এই পদ্ধতিকে ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি অথবা মেথড বলে।

সমান্তরাল ডেটা ট্রান্সমিশন কী?
প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে সমান্তরালে ডেটা চলাচল করলে তাকে সমান্তরাল ডেটা ট্রান্সমিশন বলে।

অনুক্রম বা সিরিয়ালডেটা ট্রান্সমিশন কী?
প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে একটি বিটের পর অপর বিট স্থানান্তর হলে তাকে অনুক্রম ডেটা ট্রান্সমিশন বলে।

বিট সিনক্রোনাইজেশন কী?
অনুক্রম বা সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে সিগন্যাল পাঠানোর সময় বিভিন্ন বিটের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিকে বলা হয় বিট সিনক্রোনাইজেশন।

অ্যাসিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড কী?
অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে(Asynchronous Transmission) ডেটা প্রেরক হতে প্রাপকে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার পাঠানো হয়। এ ধরনের ট্রান্সমিশনে প্রেরক যে কোনো সময় ডেটা প্রেরণ এবং প্রাপক তা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ক্যারেক্টারের শুরুতে একটি Start Bit এবং শেষে একটি Stop Bit পাঠানো হয়।

সিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড কী?
সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে প্রেরক হতে প্রাপকে ডেটা ব্লক আকারে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে প্রেরক স্টেশনের প্রাথমিক স্টোরেজে ডেটাগুলিকে সংরক্ষণ করে নেওয়া হয়। তারপর ডেটার ক্যারেক্টারগুলোকে ব্লক বা প্যাকেট আকারে ভাগ করে প্রতিবারে একটি করে ব্লক বা প্যাকেট ট্রান্সমিট করা হয়। সাধারণত 80 হতে 132 টি ক্যারেক্টার নিয়ে এক একটি ব্লক তৈরি হয়।

ডেটা ট্রান্সমিশন মোড কী?
উৎস থেকে গন্তব্যে ডেটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ডেটা প্রবাহের দিককে বলা হয় ডেটা ট্রান্সমিশন মোড।

সিমপ্লেক্স মোড কী?
এই ডেটা ট্রান্সমিশন মোডে কেবলমাত্র একদিকে ডেটা প্রেরনের ব্যবস্থা থাকে। যেমন: কীবোর্ড থেকে কম্পিউটারে ডেটা প্রেরণ।

হাফ-ডুপ্লেক্স মোড কী?
এই ডেটা ট্রান্সমিশন মোডে ডেটা উভয় দিকে প্রবাহিত হয় কিন্তু একসাথে নয়। যেমনঃ ওয়াকি-টকির মাধ্যমে যোগাযোগ।

ফুল-ডুপ্লেক্স মোড কী?
এই ডেটা ট্রান্সমিশন মোডে ডেটা একই সময়ে উভয় দিকে প্রবাহিত হয়। এই মোডে একই সময়ে এক সাথে প্রেরক বা প্রাপক ডেটা গ্রহণ বা প্রেরন করতে পারে। যেমন: মোবাইল ফোন, টেলিফোন।

ডেটা কমিউনিকেশনের মাধ্যম কী?
ডেটা আদান-প্রদানের জন্য প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের দরকার। এই সংযোগকে চ্যানেল বা মাধ্যম বলে।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবল কী?
দুটি বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ও অপরিবাহী পদার্থের সাহায্যে এ ক্যাবল তৈরি করা হয়। ভেতরের পরিবাহী তারটি কপার ওয়্যার যার মধ্য দিয়ে ডেটা প্রবাহিত হয়। ভেতরের পরিবাহী ও বাইরের পরিবাহী তারকে পৃথক রাখার জন্য এদের মাঝখানে অন্তরক পদার্থ হিসেবে ফোমের ইন্সুলেশন ব্যবহার করা হয় এবং বাইরের পরিবাহী তারকে প্লাস্টিকের জ্যাকেট দ্বারা ডেকে রাখা হয়।

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল কী?
টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের মধ্য দিয়ে সিগন্যাল ট্রান্সমিট করার জন্য দুটি পরিবাহী কপার বা তামার তারকে পরস্পর সমভাবে পেঁচিয়ে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল তৈরি করা হয়। পেঁচানো তার দুটিকে পৃথক রাখার জন্য এদের মাঝে অপরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এধরনের ক্যাবলে সাধারণত মোট ৪ জোড়া তার ব্যবহার করা হয়।
রেডিও ওয়েভ কী?
১০ কিলোহার্টজ থেকে ১ গিগাহার্টজের মধ্যে সীমিত ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক স্প্রেকট্রামকে বলা হয় রেডিও ওয়েভ।

মাইক্রোওয়েভ কী?
মাইক্রোওয়েভ এক ধরনের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যা সেকেন্ডে প্রায় ১ গিগা বা তার চেয়ে বেশিবার কম্পন বিশিষ্ট।

ইনফ্রারেড কী?
যে সকল তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা ১ মাইক্রোমিটার থেকে ১ মিলিমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত তাদেরকে বলা হয় ইনফ্রারেড ওয়েব বা অবলোহিত বিকিরণ রশ্মি।

হটস্পট কী?
হটস্পট হচ্ছে এক ধরনের ওয়্যারলেস নেটয়ার্ক।

Bluetooth কী?
ব্লুটুথ হচ্ছে একটি ওয়্যারলেস প্রযুক্তি যার মাধ্যমে একটি ওয়্যারলেস পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (WPAN) সৃষ্টি করা যায়। এর দূরত্ব সাধারণত ১০ থেকে ১০০ মিটার হয়ে থাকে।

Wi-Fi কী?
Wi-Fi শব্দটি Wireless Fidelity শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ওয়াই-ফাই হলো জনপ্রিয় একটি তারবিহীন নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তি যা বেতার তরঙ্গকে ব্যবহার করে থাকে। এর মাধ্যমে ওয়্যারলেস লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (WLAN) তৈরি করা যায়।

WiMAX কী?
WiMAX এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Worldwide Interoperability for Microwave Access। ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তির মাধ্যমে উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড সেবা, তারবিহীন ব্যবস্থায় বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ইন্টারনেট অ্যাকসেস করার সুযোগ পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে ওয়্যারলেস মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (WMAN) তৈরি করা যায়।

CDMA কী?
CDMA পূর্নরুপ হল Code Division Multiple Access।

FDMA কী?
FDMA পূর্নরুপ হল Frequency Division Multiple Access।

TDMA কী?
TDMA পূর্নরুপ হল Time Division Multiple Access।

GSM কী?
GSM পূর্নরুপ হল Global System for Mobile.

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কী?
যখন দুই বা ততোধিক কম্পিউটার তার বা তারবিহীন মাধ্যমের সাহায্যে সংযুক্ত হয়ে তথ্য, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ইত্যাদি শেয়ার করে তখন উক্ত ব্যবস্থাকে বলা হয় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

PAN কী?
প্যান (PAN) এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Personal Area Network। সাধারণত ১০ মিটার এর মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনো ব্যক্তির বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে তৈরি নেটওয়ার্কে PAN বলে।

LAN কী?
LAN এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Local Area Network। সাধারণত ১০ কি.মি. বা তার কম পরিসরের জায়গার মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার বা অন্যকোনো পেরিফেরাল ডিভাইস (যেমন- প্রিন্টার) সংযুক্ত করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় তাকে LAN বলে।

MAN কী?
MAN এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Metropolitan Area Network। একই শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কম্পিউটারসমূহ, বিভিন্ন ডিভাইস ও LAN গুলোর সংযোগে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয় তাকে MAN বলে।

WAN কী?
WAN এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Wide Area Network। অনেক বড় ভৌগোলিক বিস্তৃতিতে অবস্থিত LAN , MAN ,কম্পিউটার ও বিভিন্ন ডিভাইসসমূহের সংযোগে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয় তাকে WAN বলে। WAN এর বিস্তৃতি সমগ্র দেশ বা পৃথিবী জুড়ে হতে পারে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় WAN এর উদাহরণ হলো ইন্টারনেট।

মডেম কী?
মডেম হচ্ছে একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস যা মডুলেশন ও ডিমডুলেশনের মাধ্যমে এক কম্পিউটারের তথ্যকে অন্য কম্পিউটারে টেলিফোন লাইনের সাহায্যে পৌঁছে দেয়।

NIC কী?
NIC এর পুর্নরূপ হচ্ছে Network Interface Card। কম্পিউটারকে নেটওয়ার্ক এর সাথে সংযুক্ত করার জন্য নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড ব্যবহার করা হয়। এ কার্ডকে ল্যান কার্ড বা নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার কার্ডও বলে।

হাব কী?
হাব একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং একে LAN ডিভাইসও বলা হয়। যার সাহায্যে নেটওয়ার্কের কম্পিউটারসমূহ পরস্পরের সাথে কেন্দ্রিয়ভাবে যুক্ত থাকে। প্রেরক থেকে প্রাপ্ত ডেটা হাব সকল পোর্টে ব্রডকাস্ট করে।

সুইচ কী?
সুইচ একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং একে LAN ডিভাইসও বলা হয়। যার সাহায্যে নেটওয়ার্কের কম্পিউটারসমূহ পরস্পরের সাথে কেন্দ্রিয়ভাবে যুক্ত থাকে। প্রেরক থেকে প্রাপ্ত ডেটা সুইচ সুনির্দিষ্ট পোর্টে পাঠিয়ে দেয়।

রাউটার কী?
রাউটার একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং একে WAN ডিভাইসও বলা হয়। এটি একটি বুদ্ধিমান ডিভাইস যা একই প্রটোকল বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক নেটওয়ার্ককে(LAN,MAN,WAN) সংযুক্ত করে WAN তৈরি করে।

ব্রিজ কী?
ব্রিজ একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস যা একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ককে ছোট ছোট সেগমেন্টে বিভক্ত করে। এর সাহায্যে ভিন্ন মাধ্যম অথবা ভিন্ন কাঠামো বিশিষ্ট একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করা যায়। কিন্তু এর সাহায্যে ভিন্ন প্রটোকল বিশিষ্ট একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করা যায় না।

গেটওয়ে কী?
গেটওয়ে একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং একে WAN ডিভাইসও বলা হয়। এটি ভিন্ন প্রটোকল বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক নেটওয়ার্ককে(LAN,MAN,WAN) সংযুক্ত করে WAN তৈরি করে। গেটওয়ে ভিন্ন নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করার সময় প্রটোকল ট্রান্সলেশন করে থাকে।

রিপিটার কী?
নেটওয়ার্ক মিডিয়ার মধ্য দিয়ে ডেটা সিগন্যাল প্রবাহের সময় নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার পর এটেনুয়েশনের কারণে সিগন্যাল আস্তে আস্তে দূর্বল হয়ে পড়ে। তখন এই সিগন্যালকে এমপ্লিফাই বা পুনরোদ্ধার করে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়। মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে এই কাজটি যে ডিভাইস করে থাকে তাকে রিপিটার বলে।

নেটওয়ার্ক টপোলজি কী?
নেটওয়ার্কে কম্পিউটারসমূহ যে জ্যামিতিক সন্নিবেশে সংযোগ করা হয় সেই জ্যামিতিক সন্নিবেশকে নেটওয়ার্ক টপোলজি বলে।

বাস টপোলজি কী?
যে টপোলজিতে একটি মূল তারের সাথে সবগুলো কম্পিউটার বা নোড সংযুক্ত থাকে তাকে বাস টপোলজি বলা হয়। সংযোগ লাইনকে সাধারণত বাস বলা হয়।

ব্যাকবোন কী?
বাস টপোলজির প্রধান ক্যাবলটিকে বলা হয় ব্যাকবোন।

স্টার টপোলজি কী?
স্টার টপোলজিতে নেটওয়ার্কের সবগুলো কম্পিউটার বা নোড একটি কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক ডিভাইসের (সুইচ,হাব) সাথে সংযুক্ত থাকে।

রিং টপোলজি কী?

রিং টপোলজিতে প্রতিটি কম্পিউটার তার পার্শ্ববর্তী কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে। এভাবে রিংয়ের সর্বশেষ কম্পিউটারটি প্রথমটির সাথে যুক্ত হয়।

ট্রি টপোলজি কী?
ট্রি টপোলজিতে একাধিক হাব বা সুইচ ব্যবহার করে সমস্ত কম্পিউটারগুলো একটি বিশেষ স্থানে সংযুক্ত করা হয় যাকে রুট বলা হয়। এ টপোলজিতে প্রথম স্তরের কম্পিউটার গুলো দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটার গুলোর হোস্ট হয়। একইভাবে দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটার গুলো তৃতীয় স্তরের কম্পিউটার গুলোর হোস্ট হয়।

মেশ টপোলজি কী?
মেস টপোলজির ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের অধীনস্থ প্রত্যেকটি কম্পিউটার একে অপরের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে। এই টপোলজিতে যদি যোগাযোগের একটি পথ নষ্ট হয় তবে বিকল্প আরেকটি পথ থাকে যোগাযোগের জন্য।

হাইব্রিড টপোলজি কী?
ভিন্ন টপোলজির একাধিক টপোলজি নিয়ে গড়ে ওঠে হাইব্রিড টপোলজি।

ক্লাউড কম্পিউটিং কী?
ক্লাউড কম্পিউটিং হলো ইন্টারনেট ভিত্তিক একটি বিশেষ পরিসেবা বা একটা ব্যবসায়িক মডেল, যেখানে বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স শেয়ার, কম্পিউটিং সেবা, সার্ভার, স্টোরেজ, সফটওয়্যার প্রভৃতি সেবা সহজে ক্রেতার সুবিধা মতো, চাহিবামাত্র ও চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান করা বা ভাড়া দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় – অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ।

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে সময় বেশি লাগে কেন? ব্যাখ্যা কর।
অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে ডেটা প্রেরক হতে প্রাপকে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট হয়। এ ধরনের ট্রান্সমিশনে প্রেরক যে কোনো সময় ডেটা প্রেরণ করতে পারে এবং প্রাপক তা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য প্রেরকের কোন প্রাথমিক স্টোরেজে ডেটা সংরক্ষনের প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি ক্যারেক্টারের শুরুতে একটি স্টার্ট বিট এবং শেষে একটি স্টপ বিট যোগ করে পাঠানো হয়। ফলে মূল ডেটার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি ক্যারেক্টার পাঠানোর মাঝখানের সময়ের ব্যবধান ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। অর্থাৎ এই ট্রান্সমিশন মেথডে ডেটা ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট হয় এবং মূল ডেটার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ট্রান্সমিশনে সময় বেশি লাগে।

ক্যারেক্টর বাই ক্যারেক্টর ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে প্রাইমারি মেমোরির প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর।
সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে ডেটা প্রেরক হতে প্রাপকে ব্লক আকারে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে প্রেরক স্টেশনের ডেটাগুলিকে প্রাথমিক স্টোরেজে ডেটাগুলো সংরক্ষণ করে নেওয়া হয়। তারপর ডেটার ক্যারেক্টারগুলোকে ব্লক বা প্যাকেট আকারে ভাগ করে প্রতিবারে একটি করে ব্লক বা প্যাকেট ট্রান্সমিট করা হয়। দুটি ব্লকের মাঝখানে সময় বিরতি সমান হয়ে থাকে। ব্লক ডেটার শুরুতে এবং শেষে যথাক্রমে হেডার এবং ট্রেইলর ইনফরমেশন থাকে। সাধারণত 80 হতে 132 টি ক্যারেক্টার নিয়ে এক একটি ব্লক তৈরি হয়। অর্থাৎ ডেটা ক্যারেক্টারগুলোকে ব্লক বা প্যাকেট তৈরির জন্য মেমোরির প্রয়োজন হয়।
“সমান বিরতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন করা যায়”-ব্যাখ্যা কর।

রেডিও এর ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যাখ্যা কর।
যে ডেটা ট্রান্সমিশন মোডে কেবলমাত্র একদিকে ডেটা প্রেরনের ব্যবস্থা থাকে তাকে সিমপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোড বলে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো রেডিও। এই ব্যবস্থায় রেডিও ট্রান্সমিটার,

রেডিও রিসিভার এবং এন্টেনা থাকে। রেডিও কমিউনিকেশন ব্যবস্থায় রেডিও ট্রান্সমিটার শব্দকে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গে রূপান্তরিত করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠায়। অপরদিকে এন্টেনার সাহায্যে রেডিও রিসিভার সিগন্যাল গ্রহণ করে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করে। এক্ষেত্রে রেডিও ট্রান্সমিটার কেবলমাত্র সিগন্যাল প্রেরণ এবং রেডিও রিসিভার সিগন্যাল রিসিভ করতে পারে। অর্থাৎ রেডিও কমিউনিকেশন ব্যবস্থায় একমুখী তথ্য সম্প্রচার বা সিমপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোডে ডেটা ট্রান্সফার হয়ে থাকে।

ওয়াকিটকিতে যুগপৎ কথা বলা ও শোনা সম্ভব নয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

ওয়াকিটকির ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হচ্ছে **হাফ**–ডুপ্লেক্স। **হাফ**–ডুপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোডে ডেটা উভয় দিকে প্রবাহিত হয় কিন্তু একসাথে নয়। এই মোডে যেকোন প্রান্ত একই সময়ে কেবলমাত্র ডেটা গ্রহণ বা প্রেরন করতে পারে। ডেটা গ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ডেটা প্রেরণ করতে পারে অথবা ডেটা প্রেরণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ডেটা গ্রহণ করতে পারে। যেহেতু ওয়াকিটকির ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হচ্ছে **হাফ**–ডুপ্লেক্স তাই যুগপৎ কথা বলা ও শোনা সম্ভব নয়।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকে কোন ট্রান্সমিশন মোডের সাথে তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

হাফ-ডুপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোডে ডেটা উভয় দিকে প্রবাহিত হয় কিন্তু একসাথে নয়। এই মোডে যেকোন প্রান্ত একই সময়ে কেবলমাত্র ডেটা গ্রহণ বা প্রেরন করতে পারে। ডেটা গ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ডেটা প্রেরণ করতে পারে অথবা ডেটা প্রেরণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ডেটা গ্রহণ করতে পারে। সাধারণত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীরা নিরব থেকে শুনে অপরপক্ষে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করার সময় শিক্ষক নিরবে শুনে থাকে। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে উভয়দিকে ডেটা ট্রান্সফার হয় কিন্তু যুগপৎভাবে না। তাই শ্রেণিকক্ষের ডেটা ট্রান্সমিশন মোডকে হাফ-ডুপ্লেক্স মোড এর সাথে তুলনা করা যায়।

ওয়াকিটকির ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যাখ্যা কর।

মোবাইল ফোনের ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যাখ্যা কর।

মোবাইল ফোনের ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হলো ফুল-ডুপ্লেক্স। ফুল-ডুপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোডে ডেটা একই সময়ে উভয় দিকে প্রবাহিত হয়। এই মোডে একই সময়ে এক সাথে প্রেরক বা প্রাপক ডেটা গ্রহণ এবং প্রেরন করতে পারে। যেমন: মোবাইল ফোন, টেলিফোন ইত্যাদি। বর্তমানে আমরা কথা বলার জন্য যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি, সেগুলোর সবগুলোই ফুল-ডুপ্লেক্স ডিভাইস। এসব প্রযুক্তির ফলে প্রেরক ও প্রাপক একই সাথে তথ্য আদান প্রদান করতে পারে।

কোন ট্রান্সমিশনে একই সঙ্গে উভয়দিকে ডেটা আদান-প্রদান করা যায়?- ব্যাখ্যা কর।

ফুল-ডুপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোডে একই সঙ্গে উভয়দিকে ডেটা আদান-প্রদান করা যায়। এই মোডে একই সময়ে এক সাথে প্রেরক বা প্রাপক ডেটা গ্রহণ এবং প্রেরন করতে পারে। যেমন: মোবাইল ফোন, টেলিফোন ইত্যাদি। বর্তমানে আমরা কথা বলার জন্য যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি, সেগুলোর সবগুলোই ফুল-ডুপ্লেক্স ডিভাইস। এসব প্রযুক্তির ফলে প্রেরক ও প্রাপক একই সাথে তথ্য আদান প্রদান করতে পারে।

'ডেটা আদান ও প্রদান একই সময়ে সম্ভব'- ব্যাখ্যা কর।

৯৬০০ bps ব্যাখ্যা কর।

৯৬০০ bps বলতে বুঝায়, প্রতি সেকেন্ডে ৯৬০০ বিট ডেটা স্থানান্তরিত হয়। প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমান ডেটা ট্রান্সফার হয় তাকে ব্যান্ডউইথ বা ট্রান্সমিশন স্পিড বলে। ভয়েস ব্যান্ডের ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড হলো ৯৬০০ bps।

ভয়েস ব্যান্ড টেলিফোনে বেশি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কম্পিউটার থেকে প্রিন্টার বা কার্ড রিডারে ডেটা স্থানান্তরে ব্যবহৃত হয়।

ব্যান্ডউইথ ১২৮ kbps বলতে কী বুঝ?

"ডেটা ট্রান্সমিশনে আলোকে রশ্মি পরিবাহী তার উত্তম"-ব্যাখ্যা কর।
ডেটা ট্রান্সমিশনে আলোক রশ্মি পরিবাহী তার হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল হল এক ধরনের আলো পরিবাহী তার যা এক বা একাধিক অপটিক্যাল ফাইবার সমন্বয়ে তৈরি। অপটিক্যাল ফাইবার হলো কাঁচ অথবা প্লাস্টিকের তৈরি এক ধরনের ডাই-ইলেকট্রিক (অন্তরক) পদার্থ দ্বারা তৈরি,যা আলো পরিবহনে সক্ষম। এই তার উত্তম হওয়ার কারণ হলো- অপটিক্যাল ফাইবার তড়িৎ চৌম্বক প্রভাব হতে মুক্ত। উচ্চ গতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন হয়। পরিবেশের তাপ-চাপ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয় না। বড় ধরনের নেটওয়ার্কে এই ক্যাবল ব্যাকবোন হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

ডেটা চলাচলের জন্য ফাইবার অপটিক ক্যাবল অধিক কার্যকর কেন?
ডেটা চলাচলের দ্রুততম মাধ্যমটির বর্ণনা দাও।
অপটিক্যাল ফাইবারে দ্রুত গতিতে ডেটা আদান-প্রদানের কারণ ব্যাখ্যা কর।

ডেটা পরিবহনে ফাইবার অপটিক ক্যাবল নিরাপদ কেন?
ফাইবার অপটিক ক্যাবল হল এক ধরনের আলো পরিবাহী তার যা এক বা একাধিক অপটিক্যাল ফাইবার সমন্বয়ে তৈরি। অপটিক্যাল ফাইবার কাঁচ অথবা প্লাস্টিকের তৈরি এক ধরনের ডাই-ইলেকট্রিক (অন্তরক) পদার্থ দ্বারা তৈরি,যা আলো পরিবহনে সক্ষম। ডেটা পরিবহনে ফাইবার অপটিক ক্যাবল নিরাপদ কারণ- ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল এর পরিবর্তে আলোক সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে। তড়িৎ চৌম্বক প্রভাব হতে মুক্ত। পরিবেশের তাপ-চাপ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

আলোর গতির ন্যায় ডেটা প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত ক্যাবলটি ব্যাখ্যা কর।
আলোর গতিতে ডেটা স্থানান্তর হয় অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল হল এক ধরনের আলো পরিবাহী তার যা এক বা একাধিক অপটিক্যাল ফাইবার সমন্বয়ে তৈরি। অপটিক্যাল ফাইবার কাঁচ অথবা প্লাস্টিকের তৈরি এক ধরনের ডাই-ইলেকট্রিক (অন্তরক) পদার্থ দ্বারা তৈরি,যা আলো পরিবহনে সক্ষম। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ইলেক্ট্রিক্যাল সিগনালের পরিবর্তে আলোক বা লাইট সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে। এতে আলোকের পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন পদ্ধতিতে ডেটা উৎস থেকে গন্তব্যে গমন করে। পরিবেশের তাপ-চাপ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অত্যাধিক উচ্চ গতিতে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে।

"আলোর গতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন করা সম্ভব"-ব্যাখ্যা কর।

"অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলকে নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন বলা হয়"- ব্যাখ্যা কর।
অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল হল এক ধরনের আলো পরিবাহী তার যা এক বা একাধিক অপটিক্যাল ফাইবার সমন্বয়ে তৈরি। অপটিক্যাল ফাইবার কাঁচ অথবা প্লাস্টিকের তৈরি এক ধরনের ডাই-ইলেকট্রিক (অন্তরক) পদার্থ দ্বারা তৈরি,যা আলো পরিবহনে সক্ষম। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলকে নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন বলা হয় কারণ- এই ক্যাবল ইলেক্ট্রিক্যাল সিগনালের পরিবর্তে আলোক বা লাইট সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে। এতে আলোকের পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন পদ্ধতিতে ডেটা উৎস থেকে গন্তব্যে গমন করে। পরিবেশের তাপ-চাপ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এটি অত্যধিক উচ্চ গতিতে বা আলোর গতিতে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে। একটি নেটওয়ার্কের ব্যাকবোনের মধ্যে দিয়ে দ্রুত গতিতে ডেটা ট্রান্সফার হতে হয়, যেহেতু অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মধ্য দিয়ে দ্রুত গতিতে ডেটা ট্রান্সফার হয়। তাই অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলকে নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন বলা হয়।

ফাইবার অপটিক্স ক্যাবল ই এম আই (EMI) মুক্ত কেন?
অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল হল এক ধরনের আলো পরিবাহী তার যা এক বা একাধিক অপটিক্যাল ফাইবার সমন্বয়ে তৈরি। অপটিক্যাল ফাইবার কাঁচ অথবা প্লাস্টিকের তৈরি এক ধরনের ডাই-ইলেকট্রিক (অন্তরক) পদার্থ দ্বারা তৈরি,যা আলো পরিবহনে সক্ষম। এটি ইলেকট্রিক সিগনালের পরিবর্তে আলোক বা লাইট সিগন্যাল ট্রান্সমিট করার ফলে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলে কোনো তড়িৎ এর উপস্থিতি নেই। অর্থাৎ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলে তড়িৎ এর উপস্থিতি না থাকার কারণে ক্যাবলটি ইএমআই (EMI) মুক্ত।

অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যান্ডউডথ বুঝিয়ে লেখ।
অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল হল এক ধরনের আলো পরিবাহী তার যা এক বা একাধিক অপটিক্যাল ফাইবার সমন্বয়ে তৈরি। অপটিক্যাল ফাইবার কাঁচ অথবা প্লাস্টিকের তৈরি এক ধরনের ডাই-ইলেকট্রিক (অন্তরক) পদার্থ দ্বারা তৈরি,যা আলো পরিবহনে সক্ষম। আবার প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমান ডেটা(বিট) ট্রান্সফার হয় তাকে ব্যান্ডউইথ বা ট্রান্সমিশন স্পিড বলে। অপটিক্যাল ফাইবারে ব্যান্ডউইথ হচ্ছে 100mbps থেকে 2gbps। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে কমপক্ষে 100mb ডেটা স্থানান্তরিত হয়।

আলোর পুর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন পদ্ধতিতেও ডেটা ট্রান্সমিশন সম্ভব-ব্যাখ্যা কর।
অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মধ্য দিয়ে আলোর পুর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন সম্ভব। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল হল এক ধরনের আলো পরিবাহী তার যা এক বা একাধিক অপটিক্যাল ফাইবার সমন্বয়ে তৈরি। অপটিক্যাল ফাইবারে একই পদার্থ দ্বারা তৈরি দুটি ভিন্ন প্রতিসরাঙ্কের আলোক পরিবাহক থাকে। যার ভেতরেরটিকে বলা হয় কোর এবং বাইরেরটিকে বলা হয় ক্ল্যাডিং। কোরের প্রতিসরাঙ্ক ক্ল্যাডিংয়ের প্রতিসরাংকের তুলনায় বেশি হয়, ফলে কোরের মধ্য দিয়ে আলোর পুর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সফার হয়।

অপটিক্যাল ফাইবার তৈরিতে মাল্টিকম্পোনেন্ট কাঁচ ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
অতি স্বচ্ছ ও রাসায়নিকভাবে সুস্থির, সোডা বোরো সিলিকেট, সোডালাইম সিলিকেট ও সোডা অ্যালুমিনা সিলিকেটকে মাল্টিকম্পোনেন্ট কাঁচ বলা হয়। সাধারণ কাঁচের তুলনায় মাল্টিকম্পোনেন্ট কাঁচে স্বচ্ছ আলোর পুর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে এবং সিগন্যাল ক্ষয় কম হয়। যেহেতু অপটিক্যাল ফাইবারে আলোর পুর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে ডেটা স্থানান্তরিত হয়। তাই অপটিক্যাল ফাইবার তৈরিতে মাল্টিকম্পোনেন্ট কাঁচ ব্যবহার করা হয়।

কোন ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার মুখোমুখি থাকে এবং কেন?
মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থায় ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার মুখোমুখি থাকে। মাইক্রোওয়েভ এক ধরনের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যা সেকেন্ডে প্রায় ১ গিগা বা তার চেয়ে বেশিবার কম্পন বিশিষ্ট। মাইক্রোওয়েভ সংযোগ ব্যবহার করে ডেটা, ছবি, শব্দ স্থানান্তর করা সম্ভব। মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম মূলত দুটো ট্রান্সসিভার নিয়ে গঠিত। এর একটি সিগন্যাল ট্রান্সমিট এবং অন্যটি রিসিভ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। মাইক্রোওয়েভ বাঁকা পথে চলতে পারে না। মাইক্রোওয়েভ মাধ্যমে প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে কোনো বাধা থাকলে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে না। তাই মাইক্রোওয়েভ ব্যবস্থায় ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার মুখোমুখি থাকে।

"স্বল্প দূরত্বে বিনা খরচে ডেটা স্থানান্তর সম্ভব"- ব্যাখ্যা কর।
ব্লুটুথ টেকনোলজির সাহায্যে সল্প দূরত্বে বিনা খরচে ডেটা স্থানান্তর সম্ভব। ব্লুটুথ হচ্ছে একটি ওয়্যারলেস টেকনোলজি যার মাধ্যমে একটি ওয়্যারলেস পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (WPAN) সৃষ্টি করা যায়। এর দূরত্ব

সাধারণত ১০ থেকে ১০০ মিটার হয়ে থাকে। ব্লুটুথ সম্বলিত ডিভাইসগুলো ওয়্যারলেস পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে বিনা খরচে ডেটা স্থানান্তর করতে পারে। এর ডেটা ট্রান্সফার রেট প্রায় ১ মেগাবিট/সেকেন্ড বা তার চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

Wi-Fi জোনে ডেটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিভাবে করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

Wi-Fi শব্দটি Wireless Fidelity শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ওয়াই-ফাই হলো জনপ্রিয় একটি তারবিহীন নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তি যা বেতার তরঙ্গকে ব্যবহার করে থাকে। এর এরিয়া একটি কক্ষ, একটি ভবন কিংবা সাধারণত ইনডোরের ক্ষেত্রে এ দূরত্ব ৩২ মিটার এবং আউটডোরের ক্ষেত্রে ৯৫ মিটারের মতো এলাকা জুড়ে হতে পারে। ওয়াই-ফাই এনাবল্ড যেকোনো ডিভাইস যেমন- একটি পার্সোনাল কম্পিউটার, স্মার্টফোন প্রভৃতি একটি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক অ্যাকসেস পয়েন্টের মাধ্যমে ওয়াই-ফাই এর সাথে যুক্ত হতে পারে। ওয়াই-ফাই এর অটো কনফিগারেশন থাকায় এটি সহজে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু ডেটা ও নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ঝুঁকি থেকে যায়। তাই ডেটা ও নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ঝুঁকি এরাতে পাসওয়ার্ড এবং ডেটা এনক্রিপশন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলে অনুমোদনহীন কোন ডিভাইস নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে পারবে না।

Wi-Fi পাসওয়ার্ড এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

কোন ক্ষেত্রে Wi-Fi এর পরিবর্তে Wi-Max ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত –ব্যাখ্যা কর।

Wi-Fi শব্দটি Wireless Fidelity শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ওয়াই-ফাই হলো জনপ্রিয় একটি তারবিহীন নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তি যা বেতার তরঙ্গকে ব্যবহার করে থাকে। এর এরিয়া একটি কক্ষ, একটি ভবন কিংবা পাশাপাশি দুই-তিনটি ভবন জুড়ে হতে পারে। অপরদিকে, WiMAX এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Worldwide Interoperability for Microwave Access। ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তির মাধ্যমে উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড সেবা, তারবিহীন ব্যবস্থায় বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ইন্টারনেট অ্যাকসেস করার সুযোগ পাওয়া যায়। অর্থাৎ কভারেজ এরিয়া সাধারণত ১০ কিমি হতে শুরু করে ৬০ কিমি এর মধ্যে ইন্টারনেট সেবা প্রয়োজন হলে। এছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলেও উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড সেবা পাওয়ার জন্য; এমনকি যেখানে ফোনের সংযোগ পৌঁছেনি সেখানেও Wi-Fi এর পরিবর্তে Wi-Max ব্যবহার যুক্তিযুক্ত।

Wi-Fi ও Wi-Max এর মধ্যে একটি মিল ও একটি অমিল লিখ।

2G ও 3G নেটওয়ার্কের মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক? ব্যাখ্যা কর।

2G ও 3G নেটওয়ার্কের মধ্যে 3G নেটয়ার্ক বেশি সুবিধাজনক। 3G নেটওয়ার্কে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্যাকেট সুইচিং ও সার্কিট সুইচিং উভয় পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়। তবে প্যাকেই সুইচিং পদ্ধতির সাহায্যে খুব দ্রুত ছবি ও ভয়েস আদান প্রদান করা যায়। EDGE পদ্ধতি কার্যকর হয়। ফলে অধিক পরিমান ডেটা স্থানান্তর করা যায়। ডেটা স্থানান্তরের গতি 2 Mbps এর অধিক। এছাড়া আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা আছে। যা 2G নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাই বলা যায়- 2G ও 3G নেটওয়ার্কের মধ্যে 3G নেটয়ার্ক বেশি সুবিধাজনক।

কোন নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তি সবচাইতে নির্ভর যোগ্য ডেটা আদান প্রদান করতে পারবে এবং কেন?

ডেটা কমিউনিকেশনে মডেমের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

মডেম হচ্ছে একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস যা মডুলেশন ও ডিমডুলেশনের মাধ্যমে এক কম্পিউটারের তথ্যকে অন্য কম্পিউটারে টেলিফোন লাইনের সাহায্যে পৌঁছে দেয়। উৎস কম্পিউটারের সাথে যুক্ত মডেম কম্পিউটারের ডিজিটাল সিগন্যালকে অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তর করে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বারা গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করে এবং এই প্রক্রিয়াকে মডুলেশন বলে। অপরদিকে গন্তব্য কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত মডেম সেই অ্যানালগ সিগন্যালকে আবার ডিজিটাল সিগন্যালে পরিণত করে তা কম্পিউটারের ব্যবহারোপযোগী করে এবং এই প্রক্রিয়াকে

ডিমডুলেশন বলে। অর্থাৎ ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে মডেম একই সাথে প্রেরক এবং প্রাপক হিসেবে ডেটাকে মডুলেশন এবং ডিমডুলেশন প্রকিয়ার মাধ্যমে উৎস থেকে গন্তব্যে পৌছে দেয়।

তথ্য আদান-প্রদানে মডেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে -ব্যাখ্যা কর।
শুধু মডুলেশন বা ডিমডুলেশন কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে না- ব্যাখ্যা কর।

সুইচ এবং হাবের মধ্যে কোনটি অধিকতর সুবিধাজনক? ব্যাখ্যা কর।
হাব অথবা সুইচ একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস যার সাহায্যে নেটওয়ার্কের কম্পিউটারসমূহ পরস্পরের সাথে কেন্দ্রিয়ভাবে যুক্ত থাকে। হাবের সাথে সুইচের পার্থক্য হলো; প্রেরক থেকে প্রাপ্ত ডেটা হাব সকল পোর্টে ব্রডকাস্ট করে ফলে ডেটা আদান-প্রদানে বাধার সম্ভাবনা থাকে। হাবে ডেটা আদান-প্রদানে সময় বেশি লাগে এবং নিরাপত্তা কম। অপরদিকে প্রেরক থেকে প্রাপ্ত ডেটা সুইচ সুনির্দিষ্ট পোর্টে পাঠিয়ে দেয় ফলে ডেটা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বাধার সম্ভাবনা থাকে না। সুইচে ডেটা আদান-প্রদানে সময় কম লাগে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালো। তাই বলা যায় হাবের চেয়ে সুইচ অধিকতর সুবিধাজনক।

ডেটা ট্রান্সমিশনে দুর্বল সিগন্যালকে শক্তিশালী করার উপায়-ব্যাখ্যা কর।
নেটওয়ার্ক মিডিয়ার মধ্য দিয়ে ডেটা সিগন্যাল প্রবাহের সময় নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার পর এটেনুয়েশনের কারণে সিগন্যাল আস্তে আস্তে দূর্বল হয়ে পড়ে। তখন এই সিগন্যালকে এমপ্লিফাই বা পুনরোদ্ধার করে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়। মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে এই কাজটি যে ডিভাইস করে থাকে তাকে রিপিটার বলে। অর্থাৎ নেটওয়ার্ক মিডিয়ার নির্দিষ্ট দূরত্বে রিপিটার বসিয়ে দূর্বল সিগন্যালকে শক্তিশালী করা যায়।

ক্লাউড কম্পিউটিং সেবা গ্রহণ করা হয় কেন?
ক্লাউড কম্পিউটিং হলো ইন্টারনেট ভিত্তিক একটি বিশেষ পরিসেবা বা একটা ব্যবসায়িক মডেল, যেখানে বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স শেয়ার, কম্পিউটিং সেবা, সার্ভার, স্টোরেজ, সফটওয়্যার প্রভৃতি সেবা সহজে ক্রেতার সুবিধা মতো, চাহিবামাত্র ও চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান করা বা ভাড়া দেওয়া হয়। বর্তমানে ক্লাউড কম্পিউটিং সেবা ব্যপকভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। কারণ নিজস্ব হার্ডওয্যার বা সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয় না ফলে খরচ কম। ক্লাউড সিস্টেমে যেকোনো স্থান থেকে যেকোন সময় ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আপলোড বা ডাউনলোড করা যায়। সহজে কাজকর্ম মনিটরিং করা যায় ফলে বাজেট ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কর্মকান্ড পরিচালনা করা যায়।